গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬ - ১২ জানুয়ারি, ২০১২ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

আন্না হাজারের আন্দোলন বন্ধের সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর

কেন্দ্রীয় কমিটি

আন্না হাজারে ও তাঁর সহযোগীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থগিত রাখার অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে বিস্ময় ও হতাশা প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

সংসদে পাশ হওয়া লোকপাল ও লোকায়ুক্ত বিল-২০১১ দ্বারা যখন কোনও কিছুই অর্জিত হল না, যখন ইউ পি এ সরকার সংসদ এবং প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া আশ্বাস থেকে পিছু হটল এবং সরকারের দ্বিচারী অবস্থান বদলাবার দাবিতে আরও বড় চাপ সৃষ্টি করাই ছিল অত্যন্ত জরুরি, তখন আন্দোলন গতি পাওয়ার আগেই হঠাৎ আন্না হাজারে ও তার সহযোগীদের আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জনসাধারণের সংগ্রামমুখী মানসিকতা ক্ষতিগ্রস্ত করতেই সাহায্য করবে এবং সরকারকেই শক্তি জোগাবে।

এ ছাড়া, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ-র বিরুদ্ধে এঁদের প্রচার চালাবার সিদ্ধান্ত জনগণের আন্দোলনকে সংসদীয় কানাগলির মধ্যেই আবদ্ধ করতে পারে মাত্র। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কেন্দ্র বা রাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া দলগুলি দুর্নীতি চলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে। নির্বাচনে একটি বা কয়েকটি দলের জোটকে পরাস্ত করার ডাক দিয়ে এবং একই জাতের অন্য কোনও দল বা জোটকে সরকারে আসতে সাহায্য করার এই পথ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে সাহায্য করতে পারে না। এই ধরনের পদক্ষেপ মানুষের মধ্যে সংসদীয় মোহই একমাত্র সৃষ্টি করবে এবং তার দ্বারা জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াইকে দুর্বল করবে। ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে যে, গণআন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই।

আমরা জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি, একেবারে নিম্নস্তর থেকে গণসংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে এবং সঠিক পথ অনুসরণ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও উদ্দীপনা ও তেজের সাথে অব্যাহত রাখুন।

লোকপাল ঃ সংসদে ডাঃ তরুণ মণ্ডল

ইউ পি এ সরকার লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত বিল যে আকারে পেশ করেছে আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি। বিগত অধিবেশনে লোকপাল বিল নিয়ে যে প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছিল বর্তমান বিল তার থেকে অনেকটাই বিচ্যুত। লোকপালের গঠন এবং ক্ষমতাবিধানের ক্ষেত্রে ইউ পি এ সরকার তার পূর্বপ্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে। আমরা শক্তিশালী, কার্যকর, স্বশাসিত এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত গঠনের আশা করেছিলাম। কিন্তু বর্তমান লোকপাল বিলে এমন কিছু সন্দেহজনক সংস্থান রাখা হয়েছে যার মাধ্যমে সরকার চাইলেই প্রত্যক্ষভাবে যদি নাও করে, পরোক্ষে

দুয়ের পাতায় দেখুন

চাষির জন্য কংগ্রেস-সিপিএমের নকল দরদ

কংগ্রেস ও সিপিআই(এম) হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও খেতমজুরদের দুরবস্থা নিয়ে আন্দোলনের যে বুলি আওড়াচ্ছে, সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

"কেন্দ্রে কংগ্রেস ও রাজ্যে সিপিএমের দীর্ঘ অনুসৃত নীতির ফলেই যে এ রাজ্যের কৃষক ও খেতমজুরদের জীবনের দুর্দশা ও সংকট বেড়েছে, এ সত্য থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই এই দুটি দল এখন হঠাৎ কৃষকদরদী সাজার জন্য আন্দোলনের মহড়ায় নামছে। স্বাধীনতার পর থেকেই এ দেশের গরিব চাষিদের দুরবস্থার কোনও নিরসন হয়নি। বর্তমানে অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। রাজ্যের কৃষক ও

দুয়ের পাতায় দেখুন

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, সার-বীজ-কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি, পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং ফসলের ন্যায্য দাম, দুর্নীতি, কর্মচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারী ও বেকারদের কর্মসংস্থান সহ জনগণের নানা দাবিতে

১৪ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযান

ইতিমধ্যেই বহু মানুষ জেনেছেন, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) মার্চ মাসে পার্লামেন্ট অভিযান করতে চলেছে। ১৪ মার্চ সেই বিশেষ দিন, যেদিন রাজ্যে রাজ্যের প্রান্ত প্রত্যন্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ দিল্লির রাজপথ প্রকম্পিত করে আওয়াজ তুলবে, 'সরকার তুমি জনগণের দুর্দশায় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারো না। এই দুর্দশা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তোমাকে নিতেই হবে। না হলে দেশের জনগণই তোমাকে বাধ্য করবে ব্যবস্থা নিতে'।

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে অনিশ্চিত আয়ের গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন জেরবার। অর্ধাহার-অনাহারের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সীমিত আয়ের মধ্যবিত্তও ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সামাল দিতে পারছে না। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যে সংস্কার কর্মসূচি সরকার গ্রহণ করেছে তাতে কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই বাড়ছে, চলছে বেতন হ্রাস ও বাড়তি কাজের বোঝা চাপানো। এ সবের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীরা যাতে কোনও প্রতিবাদ, আন্দোলন করতে না পারে সেজন্য চলছে অধিকার হরণের একের পর এক স্বৈরাচারী প্রয়াস। জনসংখ্যার যে বৃহৎ অংশ কৃষির সঙ্গে যুক্ত সে দিকে তো সরকারের কোনও দৃষ্টিই নেই। সরকার চাষিদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই করতে পারেনি। অন্য দিকে সরকারি প্রশ্রয়ে বিপুল হারে বেড়ে চলেছে সার-বীজ-কীটনাশক, সেচের উপকরণ ডিজেল-বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাম। তার উপর চলছে এসব নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশে লাগামছাড়া কালোবাজারি। কৃষি উৎপাদনে এক দিকে ন্যায্য দাম না পাওয়া, অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়বৃদ্ধি চাষিকে ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলছে। মহাজনী এই ঋণের সুদের হার ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের হারের ৫/৬ গুণ বেশি। ঋণের ফাঁসে পড়ে প্রতি বছর সরকারি হিসাবেই ২০/২৫ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে। জনগণের আর এক বিরাট অংশ যারা খুচরো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাদের উপরও নেমে আসতে চলেছে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির আক্রমণ।

এরই পাশাপাশি চলছে দেশ জুড়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার মারাত্মক অপচেষ্টা। কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার এনেছে শিক্ষার অধিকার আইন, যা জনগণের সঙ্গে এক চূড়ান্ত প্রতারণা। নামে শিক্ষার অধিকার আইন হলেও বাস্তবে তা অধিকার হরণের আইন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শূন্য পেলেও এই আইনে পাশ করানোর ফতোয়া জারি করা হয়েছে। এভাবে পাশ করিয়ে দেওয়া মানে শিক্ষার বুনিয়াদকেই দুর্বল করে দিয়ে উচ্চতর ক্ষেত্রে পাশফেল নির্ধারক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার এক সর্বনাশা চক্রান্ত। শিক্ষা কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি চলছে দেশ জুড়ে মদ-জুয়া-সাট্টা-অশ্লীলতার বন্যা। চলছে নারী নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার। দুর্নীতি আজ সর্বগ্রাসী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী লোকপাল গঠনের দাবি সরকার নানা টালবাহানায় মানল না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একদা মুখ ফসকে বলেছিলেন, সরকার জনগণের জন্য ১ টাকা বরাদ্দ করলে তার ৯০ পয়সাই দুর্নীতির চোরাপথে বেরিয়ে যায়। নামমাত্র হলেও সরকার যতটুকু বরাদ্দ করে জনগণ তার কতটুকু পায়, তা এই স্বীকারোক্তিতেই স্পষ্ট।

আটের পাতায় দেখুন

মহাজাতি সদনে বিরাট রাজ্য কর্মীসভা

১ জানুয়ারি মহাজাতি সদনে বিরাট কর্মীসভা। জনগণের দাবি নিয়ে পার্লামেন্ট অভিযান কর্মসূচিকে সর্বতোভাবে সফল করতে দলের প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে সর্বাত্মক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। হলের মধ্যেও শত শত কর্মীকে মেঝেতে বসতে হয়। বাইরে বসেও সহস্রাধিক কর্মী বক্তব্য শোনেন। (উপরে) কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড শঙ্কর সাহা, কমরেড ছায়া মুখার্জী সহ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা।

জয়নগরের ময়দা অঞ্চলে মদ-গাঁজা-জুয়ার বিরুদ্ধে

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের অভিযান

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত ময়দা অঞ্চলের মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা মগরাহাটের বিষমদ কাণ্ডের পর থেকেই এলাকার চোলাই মদ ও গাঁজার ঠেকের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন। ২৭ ডিসেম্বর মণিপুর বাঁশতলা মোড়ের কুখ্যাত কৈলাস মণির মদ-গাঁজার দোকানে তাঁরা অভিযান চালান। এই অসাধু ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশে মদ-গাঁজার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, যার কুপ্রভাব গোটা অঞ্চলে পড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা সংগঠনের কাছে এই দোকান ভেঙে দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছিলেন। ঐ দিন সংগঠনের কর্মীরা সম্পাদিকা ইরা ঘোষ, মানু মণ্ডল, শংকরী দাসের নেতৃত্বে ঐ ঠেকে অভিযান চালান। অভিযান চলাকালীন সাধারণ মানুষ জড়ো হয়ে এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানান। বিক্ষোভকারীদের ঐ দোকানদার আর কোনও দিন মদ গাঁজা বিক্রি না করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর মহিলারা বটতলার আরও দুটি ঠেকে অভিযান চালান। এলাকা জুড়ে মদ-জুয়া-গাঁজার বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানো হয়। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন সর্বত্র এই আন্দোলন গড়ে তুলছে।

নিস্তারিণী কলেজে এবারও ডি এস ও জয়ী

২২ ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলার নিস্তারিণী কলেজের ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে ২০টি আসনেই জয়ী হয়েছেন এ আই ডিএসও প্রার্থীরা। বিগত সি পি এম সরকারের আমলে এই কলেজটিতে দীর্ঘকাল নির্বাচন করতে দেওয়া হত না। ছাত্রীরা এআইডিএসও-র নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ থাকায় পূর্বতন অধ্যক্ষা ছিলেন ক্ষিপ্ত। প্রকাশ্যেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন — ডিএসও-কে নিস্তারিণী কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে দাঁড়াতেই দেওয়া হবে না। সিপিএমের স্থানীয় নেতারা কলেজের অফিস ঘরে বসে ছাত্রীদের উপর মস্তানদের লেলিয়ে দিতেন। সেই সময় কলেজ ছাত্রীরা এর বিরুদ্ধে সাহসী লড়াই গড়ে তোলেন। পুরুলিয়া জেলার শিক্ষানুরাগী মানুষও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে ২০০৯ সালে ছাত্রীসংসদ নির্বাচনে যেতে হয়। সেই বছরই এ আই ডিএসও প্রার্থীরা ছাত্রীসংসদ নির্বাচনে জয়ী হন এবং তারপর থেকে টানা তিনবার ধরে জিতে চলেছেন।

এস এফ আই ১৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবগুলিতেই পরাজিত হয়েছে।

ছাত্রীসংসদের সাধারণ সম্পাদিকা এবং সহ-সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে যশোদা মাহাত ও অমৃতা পাল।

গড়িয়া রেল স্টেশনের সমস্যা মেটানোর আশ্বাস

শিয়ালদহ সাউথ সেকশনের গড়িয়া স্টেশনে রেলের নিত্যযাত্রীদের সমস্যার অন্ত নেই। টিকিট কাউন্টার স্বল্প, শৌচালয় নেই, প্ল্যাটফর্মে পানীয় জল নেই, যাত্রী ছাউনি সামান্য, ট্রেনের ঘোষণার ব্যবস্থা নেই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে চোলাই মদ ও সাট্টার রমরমা ব্যবসা। একটি সরু প্যাসেজে টিকিট কাউন্টার এবং যাত্রী চলাচলের রাস্তা। ফলে প্রতিদিন গণ্ডগোল, মারামারি লেগেই আছে। দু'বছর ধরে শৌচালয়টি চালু করা হয়নি। এর বিরুদ্ধে নিত্যযাত্রীদের প্রবল ক্ষোভ রয়েছে। এস ইউ সি আই (সি) গড়িয়া আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে স্টেশনের সমস্যাগুলি নিয়ে লাগাতার স্বাক্ষর সংগ্রহ, প্রচার, সভা, স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশনের পর ১৪ ও ২১ ডিসেম্বর ডিআরএম শিয়ালদহ দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবিগুলি মেনে নিয়ে আগামী কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা কাজকর্ম শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন ডিআরএম। ২৩ ডিসেম্বর স্টেশনে সভার মাধ্যমে আন্দোলনের এই জয়ের খবর জনসাধারণকে জানানো হয়।

কংগ্রেস-সিপিএমের নকল দরদ

একের পাতার পর

খেতমজুররা ভুলে যেতে পারেন না যে, এ রাজ্যে সিপিএম দল কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসাজশে কৃষকের জমি কেড়ে নিতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে খুন ধর্ষণ সহ নারকীয় ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস চালিয়েছে। যে দুই দলের শাসনে ফসলের দাম না পেয়ে শতশত চাষিকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে, সেই দল দুটি আন্দোলনের বুলি আওড়ানোর কুৎসিত হাস্যকর নাটক করছে। বাস্তবে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের এবং সাম্প্রতিক অতীতে এ রাজ্যে সিপিএম সরকারের দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে অনুসৃত নীতির ফলে মজুতদাররা ও ধনকুবেররা বেপরোয়া মুনাফা লুঠছে এবং কৃষক ও খেতমজুররা সর্বস্বান্ত হয়েছে। বীজ-সার-কীটনাশক ও সেচের খরচ হু হু করে বেড়েছে আর চাষিরা জলের দরে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। পরিণতিতে চাষির আত্মহত্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে ভারতে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫০০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম শাসনে ঋণের দায়ে ২০০২ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ জন চাষি আত্মহত্যা করেছে। অনাহারে মারা গেছে শত শত গরিব চাষি ও খেতমজুর। এ রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি। ৯ জন ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করেছে। তাই গরিব চাষি ও খেতমজুররা আতঙ্কিত, উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে এলাকায় এলাকায় কৃষক ও খেতমজুরদের সংগঠিত করে স্তরে স্তরে বিক্ষোভ, অবস্থান, অবরোধ, ঘেরাও ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস) যখন ধাপে ধাপে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তখন সিপিএম ও কংগ্রেস উভয় দলই আন্দোলনের মহড়ায় নেমেছে, যার সাথে কৃষক ও খেতমজুরদের যথার্থ স্বার্থরক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। কৃষক ও খেতমজুরদের এই দলগুলি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। এ আই কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে প্রকৃত দীর্ঘস্থায়ী সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলে ফসলের ন্যায্য দাম, সার ডিজেলের দুর্নীতি বন্ধ করা এবং জমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ প্রতিহত করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

১৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রায়দীঘি থানার কঙ্কনদীঘি অঞ্চলের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রবীণ সদস্য কমরেড তরণী পুরকাইত শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কমরেড রবীন মণ্ডল ও কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন।

বর্গা চাষিদের অধিকার রক্ষা, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, জোতদার ও পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষি মজুরদের সংগঠিত করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। জোতদার ও কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে বহু মিথ্যা মামলায় আসামী হওয়া সত্ত্বেও আত্মগোপন করে বহু বছর ধরে তিনি চাষি-মজুরদের আন্দোলনে নেতার ভূমিকা পালন করেছেন।

কমরেড পুরকাইতের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর তাঁর সহকর্মী কমরেড সুবল সর্দার, সন্তোষ হালদার সহ কর্মী-সমর্থক ও দরদীগণ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য কমরেড প্রীতীশ কর ও কমরেড সনাতন দাস, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড উত্তম হালদার সহ লোকাল কমিটির সম্পাদক, সদস্যরা, ছাত্র-যুব, মহিলা, শ্রমিক, শিক্ষক ফ্রন্টের কর্মীবৃন্দ প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ১৪ ডিসেম্বর অগণিত সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড তরণী পুরকাইত লাল সেলাম

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উস্থি ব্লকের একতারা অঞ্চলে এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড তরণী পাইক (৭০) দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৭০-এর দশকের প্রথম দিকে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। পার্টি পরিচালিত বিভিন্ন গণআন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত বৃত্তি পরীক্ষায় দেউলা ঘটকপুর সেন্টারে ১৯৯৪ সাল থেকে নানাভাবে সাহায্য করেন। এলাকায় কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মী তৈরি করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০ নভেম্বর পল্লীতীর্থ কিশলয় অ্যাকাডেমিতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড ভোলা মণ্ডল, প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড প্রহ্লাদ কুমার পুরকাইত।

কমরেড তরণী পাইক লাল সেলাম

লোকপাল ঃ সংসদে ডাঃ তরুণ মণ্ডল

একের পাতার পর

লোকপালকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এর দ্বারা লোকপালকে একটি অকার্যকরী ও স্বাধিকারহীন সংস্থায় পর্যবসিত করা হচ্ছে। সুতরাং এইসব বিধি বিধান বাতিল করতে হবে। আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রীকে লোকপালের আওতায় আনার ক্ষেত্রে কোনও রকম ছাড় বা ব্যতিক্রমের কথা থাকা উচিত নয়। মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, প্রধানমন্ত্রী নিজে তাঁর পদকে লোকপালের আওতায় রাখার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন।

সরকারের হাতে সি বি আই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই সভায় ইতিপূর্বে অনেক বক্তাই বলেছেন, সরকার বহুক্ষেত্রে সি বি আইকে বারবার অপব্যবহার করেছে। সিবিআই-এর অতি ব্যবহার, অব্যবহার এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে অকার্যকর করে রাখার কথাও তাঁরা বলেছেন। এই সিবিআই-কে যথেষ্ট সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত কোনও কর্তৃপক্ষের অধীনে রাখা দরকার। এ কারণেই তার কার্যকলাপ লোকপালের নজরদারির আওতায় আসা প্রয়োজন। আমি আরও মনে করি সাংসদদের লোকপালের নজরদারির আওতায় আসা উচিত। সাংসদদের যে কোনও ধরনের কাজ, এমনকী সংসদের অভ্যন্তরের কার্যকলাপও লোকপালের নজরদারির বাইরে রাখা ঠিক নয়।

আমি মনে করি, লোকপাল গঠনে সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগ করা একেবারেই ঠিক নয়। এটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় শুধু নয়, এই নীতির ফলে লোকপালের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ এবং বিবাদ তৈরি হবে। ফলে একমত হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান তার কার্যকারিতা হারাবে, নির্দেশ জারিতে দেরি হবে।

লোকপাল বলতে নয় সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। এভাবে কলেবর বাড়িয়ে লোকপালকে অত্যন্ত অকার্যকরী একটি সংস্থায় দাঁড় করানো হচ্ছে।

আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি বলতে চাই — প্রথমত, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যত শক্তিশালী আইনই প্রণীত হোক না কেন তা দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে রুখতে পারে না। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা সরকারি প্রতিষ্ঠান কারও সম্পর্কে এ কথা বলা যাবে না যে, দুর্নীতি তাদের ছুঁতে পারবে না। তাই এই লোকপাল সংস্থাটি সম্পর্কেও একটি স্বাধীন সংস্থার নজরদারি থাকা দরকার, কীভাবে সেটি তৈরি করা হবে তা সংশ্লিষ্টদের সাথে লোকসভার অভ্যন্তরেও আলোচনার মাধ্যমে স্থির করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যদি শক্তিশালী লোকপাল আইনও সরকার আনে, তবুও আমরা মনে করি তার দ্বারাও এই দুর্নীতি রোধ করা যাবে না। সচেতন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণ যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া নজরদারি না করে, তা হলে দুর্নীতি রোখা অসম্ভব।

ত্রিপুরায় এ আই ডি ওয়াই-র উদ্যোগে যুব শিবির

অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে ১০-১১ ডিসেম্বর আগরতলার চারিপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এক যুবশিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। শিবিরটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। যুবশিবিরে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে প্যারেড, খেলাধূলা, বিতর্ক, গান ও কবিতা আবৃত্তি ছাড়াও আলোচনা সভা হয়। প্রায় সকল প্রতিনিধিই তাতে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেন যে, রাজ্যে একটি বামপন্থী নামধারী সরকার থাকা সত্ত্বেও মদ, জুয়া ও অপসংস্কৃতির আরও প্রসার হচ্ছে। বেকারদের কোনও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে না। তাঁরা এসবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাছাড়াও উন্নত নীতি-নৈতিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেন। যুব শিবিরে প্রায় ৩০ জনের অধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি

মিডিয়ার প্রচার ও বাস্তব

কাজ শুরু করে দিয়েছে সংবাদ মাধ্যম। সর্বাধিক প্রচারিত একটি বাংলা দৈনিক খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের পক্ষে এখান ওখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যকে নিজের ঢংয়ে পরিবেশন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে — এ ছাড়া উপায় নেই, চাষিকে যদি বাঁচাতে হয় তবে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির জন্য দরজা খুলে দিতেই হবে। যারা এর বিরোধিতা করছে তারা জনবিরোধী, উন্নয়ন বিরোধী, কৃষক বিরোধী ইত্যাদি ইত্যাদি।

বীজ ক্ষেত্রে (সীড সেক্টর) যখন ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখনও একই কথা বলেছিল ওরা। বলেছিল, এর ফলে দেশের সাধারণ কৃষকদের আয় অন্তত ২৫ শতাংশ বাড়বে। তাঁদের জীবনের মানের উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু এই নীতি গ্রহণের সাত বছর পর অভিজ্ঞতা কী? দেখা যাচ্ছে, ৪৭৫ টাকা কিলো টমাটো বীজের দাম এখন ২৫ হাজার থেকে ৭৬ হাজার টাকা (শর্মা- দেবিন্দার ২০১০)। সব বীজেরই দাম বেড়েছে অনেক। প্রথাগত বীজে চাষির অধিকার লুপ্ত। উচ্চ ফলনশীল বীজ মানে বেশি সার, বেশি জল, বেশি কীটনাশক। পরিণামে খরচ অনেক বেশি। কিন্তু চাষির জন্য ফসলের দাম নেই। শেষ পর্যন্ত ঋণের দায়ে ঘটি বাটি বিক্রি। তারপর হয় আত্মহত্যা না হয় পথের ভিখারি হওয়া।

উন্নয়নের নামে এই তো চাষির অবস্থা। এর পাশাপাশি গড়ে উঠছিল বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টোর সাথে মাহিকোর, আই টি সি জেনেকোর সাথে মাহিন্দ্র সীডস, ডুপন্টের সাথে নাথ সীডসের যৌথ উদ্যোগ। বিশ্ববাজারে ভারতীয় বীজ কোম্পানিগুলির জন্য দরজা খুলে গেছে। মুনাফার পাহাড় গড়ে উঠেছে ওদের। ফলে বীজ ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ চাষির সর্বনাশ করেছে, ভারতীয় বহুজাতিক পুঁজির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এটাই ঘটনা। একে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই প্রশ্ন উঠছে, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি এই একই কাজ করবে না তো?

এই আশঙ্কার কথা বুঝে জনমতকে বিভ্রান্ত করার তাগিদে জোর গলায় প্রচার শুরু করেছে বহুজাতিক পুঁজির ভক্ত মিডিয়াকুল। ওদের হিসাব হল, জনমতকে যদি দেশি-বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির জোট বন্ধনের পক্ষে টেনে আনা যায়, তবে সহজেই এই পরিকল্পনা কার্যকর করা যাবে। তাই ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে মিডিয়া। বিদেশি পুঁজি এ দেশে এলে, খেতের পাশে চলে যাবে কোম্পানির গাড়ি, পূর্বনির্ধারিত দামে সঠিক ওজনে ফসল কিনবে ওরা — একেবারে হাতে হাতে লাভ। ফসল বাজারে নিয়ে যাবার ঝামেলা নেই, দাম নিয়ে অনিশ্চয়তা নেই, ফড়েদের দৌরাত্ম্য নেই, মাপে ঠকবার ভয় নেই, ধলতার জুলুম নেই। এতো একেবারে রামরাজত্ব! এই রকম কল্পস্বর্গের বর্ণনা করে আনন্দ বাজারে লেখা হয়েছে — ''গ্রামে সেই ফড়েদের উৎপাত নেই। আগে ফড়ে বা দালালদের বলে দেওয়া দামে সবজি বিক্রি করতে হত। ...এখন খেতের দোরগোড়া থেকেই কোম্পানির বাবুরা ফুলকপি কিনে নিয়ে যান। বৈদ্যুতিন ওজন যন্ত্রে মাপা হয়। কত দাম পাওয়া যাবে তাও আগের দিন বলে দেওয়া হয়।''(আনন্দবাজার পত্রিকা, ০১,১২,২০১১) শুধু এই নয়। ভাল দামের পাশাপাশি কৃষকরা পাবেন, 'নতুন প্রযুক্তি, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।' (ঐ, ০৩.১২.২০১১)

ফসল বিক্রির ক্ষেত্রে ফড়েদের দৌরাত্ম্যের কথা অজানা নয়। এই 'ফড়ে' ব্যবস্থার অবসান হোক, যে কোনও বিবেকবান মানুষই তা চাইবেন। কিন্তু এই অবস্থা অবসানের উপায় কী? কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে এর অবসান হবে? বহু আগেই এস ইউ সি আই (সি) সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, খাদ্যশস্য ও নিত্যব্যবহার্য পণ্য সরকারকেই সরাসরি চাষির কাছ থেকে কিনতে হবে, ভর্তুকি দিয়ে তা বিক্রি করতে হবে গরিব মানুষকে। এই পথেই বাঁচতে পারে চাষি, বাঁচতে পারে সাধারণ মানুষ। এই পথেই কৃষি বিপণনকে 'ফড়ে রাজ' থেকে মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু এই পথে কি সরকার হেঁটেছে কখনও? বরং খাদ্যশস্যের উপর যতটুকু সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল তাও ধাপে ধাপে তুলে দেওয়া হয়েছে — কায়েম হয়েছে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের একচ্ছত্র রাজত্ব। ফলে সরকার যখন বলে ফড়ে মুক্ত করার জন্য এটা করা হচ্ছে তখন সন্দেহ জাগেই।

বিশেষজ্ঞের ঢংয়ে সংবাদপত্র লিখেছে — 'ফড়ে বা দালালদের বলে দেওয়া দামে বিক্রি করতে হয়'। চর্মচক্ষে তাই মনে হয়, ফড়েরাই ফসলের দাম ঠিক করে দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তব কি তাই? ফসলের দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে নিচে ফড়েদের অবস্থান। সবচেয়ে উপরে সিন্ডিকেটগুলো। যেমন, রাইস সিন্ডিকেট, পটাটো সিন্ডিকেট, জুট সিন্ডিকেট, হুইট সিন্ডিকেট ইত্যাদি। এই সিন্ডিকেটের মালিক বড় বড় পুঁজিপতিরা। হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা এদের। আন্তর্জাতিক শস্য বাজারের সাথে এদের সম্পর্ক। ফসলের দাম ঠিক করে দেয় এরাই। এরা ঠিক করে দেয় বাজার থেকে কী দামে ফসল কেনা হবে। কৃষক শোষণের পাণ্ডা এরাই। এদের নির্ধারিত দামের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আছে ফড়েদের? এসব কি খবরের কাগজ কর্তাদের অজানা? তা হলে এই বহুজাতিক সিন্ডিকেট কর্তাদের আড়াল করে দাম না পাওয়ার সব দায়ভাগ ফড়েদের ঘাড়ে চাপানোর এই অপচেষ্টা কেন?

আসলে এই সমস্ত খবরের কাগজওয়ালারা জানে, বিদেশি বহুজাতিক পুঁজি এসে এই দেশীয় বহুজাতিক সিন্ডিকেট কর্তাদের সাথে জোটবন্ধন গড়ে তুলবে। তখন সাধারণ চাষি এই জোটবন্ধনের শক্তিশালী চাপের মুখে পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমান ফড়েরাজও কি একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হবে? না। যাদের ক্ষমতা আছে, যাদের পুঁজির জোর থাকবে তারা এই জোটবন্ধনের এজেন্টে পরিণত হবে। অন্য ছোটখাট ফড়েরা, যাদের পুঁজির শক্তি কম, তারা বিতাড়িত হবে বাজার থেকে।

তা হলে অবস্থাটা কেমন হবে? চাষি ফসল ফলাবে, আর সেই ফসল বিপণনের সমগ্র প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করবে দেশি-বিদেশি পুঁজির শক্তিশালী জোট বা কার্টেল। এদের হাতে ফসল তুলে দেওয়া ছাড়া চাষির কোনও উপায় থাকবে না। তারা দাম ঠিক করবে, তাদের কাছ থেকেই বীজ-সার-কীটনাশক কিনতে হবে, তারাই দাদন দেবে, কী ফসল ফলাতে হবে তাও ঠিক করে দেবে এরা। চাষি বহুজাতিক পুঁজির দাসে পরিণত হবে।

ভয়াবহ এই ভবিষ্যতের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চাষিদের তুলনামূলক ভাল দাম পাওয়ার গল্প পরিবেশন করছে ঐ পত্রিকাটি। কোম্পানির বাবুরা নাকি এই ভাল দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করছে। কী দয়ার শরীর! বিপণন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি কব্জায় আনার বহুজাতিক পুঁজির এ এক কৌশলী পদক্ষেপ। এ পুঁজিবাদের বহু পুরনো কৌশল। প্রতিযোগীকে বাজার থেকে হটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে কিছুদিন লোকসানে পণ্য বিক্রি কর। পুঁজির ক্ষমতা যার বেশি শেষ পর্যন্ত সেই জয়ী হবে। তারপর বাজার নিয়ন্ত্রণে এনে, একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপনের পর দশ টাকার পণ্য এক টাকায় কিনবে, এক টাকার পণ্য দশ-বিশ-একশ টাকায় বিক্রি করবে। এই তো সহজ সরল কথা! এ বোঝার জন্য অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সংবাদপত্রের বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন — 'এ অতি বাড়াবাড়ি চিন্তা। রজ্জুতে সর্পভ্রম।' ওদের জ্ঞাতার্থে একটা তথ্য পরিবেশন করা যাক। আমেরিকার Kerr centre for sustainable agriculture জানাচ্ছে — ''Large corporation have in recent years moved to curtail farmer independence through production contracts and other forms of vertical integration.'' (The Hindu, 12.12.2011) কী এর অর্থ? কৃষকের স্বাধীনতা খর্ব করছে বহুজাতিক পুঁজি। কী করে? উৎপাদনে চুক্তি ও নানা ধরনের পণ্য কিনতে বাধ্য করে। চুক্তি চাষ যে চাষির কী ধরনের সর্বনাশ করে তা ল্যাটিন আমেরিকা, দঃপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। লক্ষ লক্ষ চাষি এইসব দেশে জমিচ্যুত হয়েছে। এ দেশে, কৃষক কমিশনের রিপোর্টেও তার ভয়াবহতা উল্লেখিত হয়েছে। ফলে কাগজ কর্তারা যাই বলুক, বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশ কৃষক শোষণের মাত্রাকে যে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

আর একটা ভয়াবহ বিপদের দিকেও লক্ষ দেওয়া দরকার। তা হল খাদ্য সুরক্ষা। বহুজাতিক পুঁজি কৃষি উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রকে ব্যবহার করবে। তাদের উদ্দেশ্য দুটো। এক, এ দেশের উর্বর জমিকে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন পণ্যোৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা, দুই, যতটুকু খাদ্য স্বয়ম্ভরতা আছে তাকে ধ্বংস করে এ দেশকে মার্কিন গমের বাজারে পরিণত করা। এতে এদেশের খাদ্যের সিন্ডিকেট মালিকদের ক্ষতি নেই। কারণ, তাদের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতেই বিদেশি পুঁজিকে এই ব্যবসা করতে হবে। খাদ্য ব্যবসায় তারাও বেশি বেশি করে বিদেশের বাজারে ঢুকতে পারবে।

খাদ্য সুরক্ষা বিপন্ন হলে অবস্থা হবে এই রকম। যা আমরা তৈরি করি তা খাই না, যা খাই তা তৈরি করি না। ভাতের থালা হয়ে পড়বে আমদানি নির্ভর। আর এই আমদানি নির্ভরতার ফল কী তা তো পেট্রোপণ্যের ক্ষেত্রে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যত দিন যাবে খাদ্যপণ্যের বিশ্ব বাজারে ফরোয়ার্ড ট্রেডিং এর প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে অস্থির বিশ্বে খাদ্য বাজারের দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা অসম্ভব। ফলে সাধারণ মানুষকে যে কী দামে খাদ্যশস্য কিনতে হবে তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। এই নীতির ফলে চাষি মরবে, মরবে সাধারণ মানুষ। আর এই নীতির পক্ষেই ওকালতি করছে সংবাদ মাধ্যম।

এবার কৃষিক্ষেত্রের উন্নত প্রযুক্তি প্রসঙ্গে আসা যাক। আমরা জানি, উন্নত প্রযুক্তি চালু করার ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক পুঁজি খুবই ব্যগ্র। 'প্রথম সবুজ বিপ্লবে' এ দেশে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। এসেছিল উচ্চ ফলনশীল বীজ-সার-কীটনাশক ইত্যাদি। তথাকথিত সেই প্রথম সবুজ বিপ্লবের ফলে এদেশের জল-জঙ্গল-জমির সর্বনাশ হয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের ৭০ শতাংশ জমি আজ প্রায় জলহীন ঊষর মরুভূমির মতো। গুজরাটের সমুদ্র উপকূলের ৩০ লক্ষ একর জমি লবণাক্ত হয়ে চিরকালের জন্য চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

এই কারণে ওদের এবার লক্ষ্য পূর্ব ভারত — পঃবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম। সাধের 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের' জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে এই এলাকা। আর তার বাহন হল আরও উন্নততর প্রযুক্তির ফসল জিন বীজ (জি এম সীড)। বিশ্বের শতকরা ৭০ শতাংশ জিন বীজ মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টোর দখলে। এদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে ভারতের মাহিকো। এদের সৃষ্ট বোলগার্ড তুলা বীজ। মনসান্টো-মাহিকো বলেছিল এই জিন বীজে চাষ করলে ফলন বেশি, খরচ কম — তাই লাভও প্রচুর। কিন্তু কী অভিজ্ঞতা আমাদের? এই বীজে চাষ করে চাষিরা ঋণের ফাঁদে জড়িয়েছে। পরিণামে দলে দলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং হচ্ছে এ দেশের কৃষকেরা। সংবাদপত্র কথিত উন্নত প্রযুক্তির এই হল লীলাখেলা।

বলা হচ্ছে, অসংখ্য হিমঘর গড়ে উঠবে, ফসল নষ্ট হবে না। দেশি-বিদেশি পুঁজি কৃষিপণ্য সংরক্ষণে পুঁজি বিনিয়োগ করে হিমঘর গড়ে তুলবে — এ আমাদের অজানা নয়। সবুজ বিপ্লবের সময় অসংখ্য হিমঘর গড়ে উঠেছিল। তাতে এ দেশের ফসল সংরক্ষণের ক্ষমতাও বেড়েছিল অনেক। কিন্তু তাতে কি গরিব চাষির উপকার হয়েছিল এক কণাও? হিমঘর মালিক ও সিন্ডিকেট কর্তাদের যোগসাজশে হিমায়নের সুযোগ গরিব চাষি প্রায় পায় না বললেই চলে। গরিব চাষির ফসল ধরে রাখার ক্ষমতা শূন্য। ধার করে চাষ করতে হয় তাকে। তাই ফসল ওঠার সময় মাঠেই তার ফসল বিক্রি করে দিতে হয়। ফসল হিমঘরে রেখে বর্ধিত দামে বিক্রি করার ক্ষমতা তার নেই। সে কারণে সংখ্যায় হিমঘর যতই বাড়ুক তার সুযোগ গ্রহণের ক্ষমতা গরিব চাষির নেই। আমরা হিমঘর তৈরির বিরোধী নই। শুধু বলতে চাই, গরিব চাষি এই বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণে অক্ষম। সুতরাং উন্নত প্রযুক্তির যে কথা বলা হচ্ছে তাতে দেশের সাধারণ চাষির সমূহ সর্বনাশ, বহুজাতিক পুঁজির পৌষমাস।

একটা কথা বোঝা দরকার। জনকল্যাণে বিদেশি পুঁজি এখানে আসতে চাইছে না। তাদের চাই মুনাফা। সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মুনাফা। এই মুনাফার খোঁজে দুনিয়া জুড়ে বহুজাতিক লুটেরাদের যে অভিযান চলছে সেই অভিযানে যোগ দিয়ে ভারতীয় বহুজাতিক লুটেরারা এ দেশের কৃষক সমাজকে সর্বনাশের অতলান্ত অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে। আর এই কাজে তাদের তল্পিবাহকদের ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম। ফলে মিডিয়ার প্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্যই আমরা গ্রাম-শহরের সাধারণ মানুষকে আবেদন করছি।

সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ অফিস তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন

সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ অফিস (সিডিও) তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৩ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে অর্থদপ্তরের সামনে এক প্রতিবাদ সভায় সিডিও-র কর্মচারীরা সামিল হন। কো-অর্ডিনেশন কমিটিভুক্ত কর্মচারীরাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন। অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপিতে বলা হয় কয়েক বছর আগে বামফ্রন্ট সরকারও শূন্যপদ ফেলে রেখে 'এই দপ্তরে কর্মচারীরা কাজ করে না' এই কুৎসা করে দপ্তরটি তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল। কর্মচারী আন্দোলনের চাপে তা পারেনি। বর্তমানে এই দপ্তরে রয়েছেন মাত্র ৬৩ শতাংশ কর্মচারী, যাঁরা প্রবল চাপ নিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সরকার ২০৯টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ৭৭টি পদ শূন্য ফেলে রেখে দপ্তর তুলে দেওয়ার কথা বলছে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে বর্তমান সরকার যে প্রশাসনে গতি আনার কথা বলছে বাস্তবে তা বিঘ্নিত হবে। শূন্যপদ বিলোপের সম্ভাবনা দেখা দেবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করার দাবি জানানো হয়। সিদ্ধান্ত না পাল্টালে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন সিডিও'র প্রবীণ নেতা স্বপন দে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন বলাই পাল ও শুভাশীষ দাস। জয়েন্ট প্লাটফরম অব অ্যাকশন-এর স্টেট সেক্টর কো-অর্ডিনেটর ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহসভাপতি বিমল জানা এর বিরুদ্ধে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ভ্রম সংশোধন ঃ বিপিটিএ বাঁকুড়া জেলা সম্মেলনে নির্বাচিত সম্পাদক মল্লিকা সরেন। পূর্বে প্রকাশিত সংবাদে অসাবধানতাবশত ভুল নাম ছাপা হয়েছিল।

পাশফেল ঃ জনমত কী বলছে

ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না

কৌশিক ভট্টাচার্য
লীলা দেবী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট,
দশদ্রোণ, উত্তর ২৪পরগণা

বিগত সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল, তাতে আমরা প্রত্যেকেই আশা করেছিলাম পরিবর্তিত সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে এর পরিবর্তন আনবে; ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে এবং পড়াশুনায় তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় বেশি দিন আসেনি, তবুও এখন থেকেই শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে হবে।

বর্তমান সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দেওয়ার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা পূর্ববর্তী সরকারের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি তুলে দেওয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই প্রথায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হয়ত বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু শিক্ষার মান অতি দ্রুত নামতে থাকবে এবং এক সময় মান বলে আর কিছুই থাকবে না। যারা সারা বছর পড়াশুনা করে এবং যারা পরীক্ষার সময় ছাড়া পড়াশুনা করে না, দু' জনের মানে কোনও ফারাক থাকবে না।

আমি সরকারের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার মান নামিয়ে দেবেন না, এতে ভবিষ্যৎ আমাদের কাউকেই ক্ষমা করবে না।

ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ চলে যাবে

আব্দুস সাদেক
কলকাতা

সরকার যে পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে তার ফলে নামীদামি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কোনও ক্ষতি হবে না। তাদের বাড়িতে পড়াশোনা করার পরিবেশ আছে। স্কুলেও তাদের শেখানোর নানা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু সাধারণ সব স্কুলে এমনিতেই নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে। অভিভাবকরাও পেটের দায়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। তাদের পক্ষে নজর দেওয়াও সম্ভব নয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা যখন দেখবে না পড়লেও পাশ, তখন তাদের পড়াশোনার আগ্রহটাই চলে যাবে। অভিভাবকদেরও আগ্রহ কমে যাবে। কোনও খোঁজ কেউ নেবে না। ক্লাস এইটের পর দেখা যাবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এর ফলে বড়লোকের ছেলেমেয়েরাই উচ্চশিক্ষায় যাবে। সরকার ওদের দেখিয়ে আমাদের বলবে ওরা তো পেরেছে, তা হলে তোমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা পারল না কেন? সবাই ছাত্রছাত্রীদের দোষ দেবে। অথচ তাদের প্রথম থেকেই মারার ব্যবস্থা হচ্ছে। যে সরকারই আসে তারাই বড়লোকের জন্য কাজ করে। এই সরকারও তাই করল!

লেখাপড়া শেখা নিয়ে ছেলেখেলা চলছে

অজন্তা নায়ার
কলকাতা

আমি যে দলকে সমর্থন করে সরকার গড়তে সাহায্য করেছি তারাও এই কাজ করল, ভাবতে পারছি না। আমার দল করছে বলেই অমি সমর্থন করতে পারছি না। সব জিনিসেরই একটা রীতি আছে। একটা পরিবার যেমন একটা সিস্টেমে চলে, সেটা ভাঙলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়, শিক্ষারও কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়ম ভাঙলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শিক্ষা দিলে পরীক্ষা নিয়ে দেখতে হবে কতটা শিখল। না শিখে থাকলে, পরীক্ষায় ফেল করলে আবার চেষ্টা করতে হবে। এটাই নিয়ম। এই নিয়ম গায়ের জোরে ভাঙা যায় না। ভাঙতে চাইলে শিক্ষার সর্বনাশ হয়। আমি মনে করি এর ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে তা পূরণ করা যাবে না। এই সিদ্ধান্ত এখনই রদ করা দরকার।

মেদিনীপুর গ্রামীণ ছাত্র সম্মেলন

যৌথবাহিনীর বুটের ভারী শব্দের মধ্যেও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দেওয়া, ফি বৃদ্ধি, লটারিতে ভর্তি, যৌনশিক্ষা চালুর বিরুদ্ধে ১৮ ডিসেম্বর মেদিনীপুর সদর গ্রামীণ ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বেলিয়ায়। জঙ্গলমহলের ধেড়ুয়া, চাঁদগুড়গুড়িপাল, মণিদহ স্কুলের ও এলাকার কলেজ ছাত্রদের নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন এলাকার ১০টি টিম অংশগ্রহণ করে। বিতর্ক, প্রবন্ধ রচনা, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। বিকেলে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এ আই ডি এস ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড ভীম মণ্ডল। তিনি বলেন এবছরই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময় গুড়গুড়িপাল স্কুলে ২৫০ টাকা ও চাঁদড়া স্কুলে ১০০ টাকা ফি কমেছে এ আই ডি এস ও-র আন্দোলনের চাপে।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রবীণ শিক্ষক চিত্তরঞ্জন দাস, নরেন্দ্র নাথ মাহাত, শিক্ষক শুভাশিস শামল। কমরেড মণ্ডল ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সংগঠক কমরেড প্রভঞ্জন জানা ও গ্রামীণ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন পাত্র। এ আই ডি এস ও-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দীপক রায়। প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ পঙ্কজ মাহাত। কমরেড অরূপ নন্দীকে সভাপতি ও কমরেড পিন্টু মাজীকে সম্পাদক করে গ্রামীণ কমিটি গঠিত হয়।

নোদাখালিতে মদবিরোধী মিছিল

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নোদাখালিতে মদের ভাটি উচ্ছেদের দাবিতে ২১ অক্টোবর এ আই এম এস এস-এর রায়পুর শাখার পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। ঐ দিন এ আই এম এস এস এবং স্থানীয় 'মানব কল্যাণ শান্তি কমিটি'র উদ্যোগে কমরেডস অনিতা সেনগুপ্ত, রীণা বক্সি ও শঙ্করী পাল এবং শান্তি কমিটির পক্ষে সুশীল কুমার ঘোষ, বাসুদেব কাবরী ও আসগর মল্লিক নোদাখালি থানায় ডেপুটেশন দেন।

প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্র সমাবেশ

এ আই ডি এস ও-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৮ ডিসেম্বর কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে স্টুডেন্টস হলে ছাত্রসভা। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই ও জেলা সম্পাদক কমরেড ইমতিয়াজ আলম। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমরেড রাজকুমার বসাক।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা প্রসঙ্গে

বিধানসভার চলতি অধিবেশনে অধ্যাপক তরুণ নস্কর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

এ রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ১-১-২০০৬ থেকে ৩১-০৩-২০১০ পর্যন্ত ৩৯ মাসের বকেয়া বেতন পাননি। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি সমমানের বেতনক্রম ঘোষণা করেছিল। শর্ত ছিল, এই বেতনক্রমের অন্তর্গত সমস্ত সুযোগ-সুবিধার প্যাকেজটি রাজ্য সরকার কার্যকর করলে সংশোধিত বেতনক্রম চালু করতে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হবে তার ৮০ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ৪ বছর ৩ মাসের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদান করবে। এই সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অন্যতম ছিল শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা। বিগত রাজ্য সরকার এই বেতনক্রমটি আংশিকভাবে কার্যকর করায় ও বিশেষ করে অবসরের বয়স বৃদ্ধি না-করায় কেন্দ্রীয় সরকার তার দেয় আর্থিক সাহায্য রাজ্য সরকারকে দেয়নি। ফলে শিক্ষকরা উক্ত বকেয়া বেতনও পাননি। রাজ্য সরকার যাতে শিক্ষকদের প্রতি সুহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উক্ত বেতনক্রম চালু করেন, তিনি সেই দাবি জানান।

বালুরঘাটে কমসোমল শিবির

প্যারেড, পিটি, খেলাধূলা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২২ ডিসেম্বর বালুরঘাট হাইস্কুলে কমসোমলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিবিরের কাজ আরম্ভ হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক। তিনি কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে কমসোমল করা দরকার সে বিষয়ে আলোচনা করেন। রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরি বড় মানুষদের জীবন চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। শিবিরে ৪৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বরাক উপত্যকায় যুব শিবিরে আন্দোলনের ডাক

সকল বেকারের কর্মসংস্থান, কাজ না পাওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকার ভাতা প্রদান, মদের ঢালাও লাইসেন্স ও অনলাইন লটারি বন্ধ করা, গণমাধ্যমে অশ্লীলতা প্রদর্শন বন্ধ করা সহ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৭-১৮ ডিসেম্বর বরাক উপত্যকা ভিত্তিক যুব শিবির কাছাড় জেলার ধোয়ারবন্দ গাঁও পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ এম ই স্কুলে। উপত্যকার তিন জেলার যুবপ্রতিনিধিদের মিলিত কণ্ঠে বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হল পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের অবসান এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার দৃঢ় অঙ্গীকার।

পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড তুষার পুরকায়স্থ। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের সর্ব ভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ধোয়ারবন্দ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মাধব ঘোষ সহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

কমরেড নন্দন নাথের সভাপতিত্বে শুরু হয় উদ্বোধনী অধিবেশন। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত 'সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে' বইটি ছিল শিবিরের আলোচ্য বিষয়। প্রতিনিধিদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন দলের কাছাড় জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামদেও কুর্মী। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান, পুঁজিবাদই সকল সমস্যার মূল কারণ এবং তার উচ্ছেদের সংগ্রামে যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল শিবিরের অন্যতম অঙ্গ।

সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। উপত্যকাব্যাপী যুবআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

বোকারোয় ডেপুটি কমিশনার অফিসে বিক্ষোভ

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানের দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বোকারো জেলা সাংগঠনিক কমিটির নেতৃত্বে ডি সি অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও দাবিপত্র দেওয়া হয়। চাস-এর ধর্মশালা মোড় থেকে শ্রমিক, চাষি, ছাত্র-যুবক, মহিলাদের এক দীর্ঘ মিছিল ডি সি অফিসের সামনে পৌঁছলে সেখানে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা সাংগঠনিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড মোহন চৌধুরি। সভায় সাংগঠনিক কমিটির জেলা সম্পাদক কমরেড রাধেশ্যাম শর্মা বলেন — মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠছে। রেশন ব্যবস্থা, ইন্দিরা আবাস যোজনা, বি পি এল-দের সস্তায় রেশন, পি ডি এস ইত্যাদি সরকারি নীতি রূপায়ণে ব্যর্থতা প্রমাণিত হচ্ছে। দেশে কৃষি উৎপাদন বাড়লেও তা গরিব মানুষের কোনও কাজে লাগছে না, পুঁজিপতিরাই মুনাফা লুঠছে। এই অবস্থায় আন্দোলনের চাপেই সরকারকে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করতে হবে।

সভাশেষে কমরেডস রামলাল মাহাতো, শংকর সিংহ, কুমেদ মাহাতো, হরিপদ, গোপাল মাহাতো, পি দুবে, আর এ ভগত প্রমুখের এক প্রতিনিধি দল অবিলম্বে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো, বেকারদের কাজ, অধিক সংখ্যক রেশন দোকান মারফত কম মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সহ ২৩ দফা দাবিপত্র ডি সি-র কাছে পেশ করেন। তাঁরা ডি সি কে বলেন, অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ভর্তির দাবিতে শীতভোরে শিশুদের লম্বা লাইন

প্রবল শীতে যখন কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় মানুষ কাঁপছে, ভোরের কুয়াশায় যখন রাস্তায় যান চলাচল দুষ্কর, ঠিক সেই সময় ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা অভিভাবকদের সাথে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু যে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের আশেপাশে তারা সমবেত হয়েছে তা নয়, হাওড়ার বেলুড় হাইস্কুল, মালদহের পিরগঞ্জ মহানন্দা হাইস্কুল, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার কেওনবাড়ি হাইস্কুল, দার্জিলিং-এর শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল সহ রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই এই চিত্র। এরা সবাই পঞ্চম শ্রেণির ভর্তিপ্রার্থী। এদের অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। আতঙ্ক তাঁদের চোখে মুখে, হাবেভাবে। এই আতঙ্কের পরিণাম কী হতে পারে তা দেখা গেছে যাদবপুর বিদ্যাপীঠ সহ রাজ্যের বহু বিদ্যালয়ে, সেখানে সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতীরা এই আতঙ্কের সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে স্কুলে ভাঙচুর চালিয়েছে। প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন চালিয়েছে। কিন্তু কেন? কী এমন ঘটল যে রাজ্যের জেলায় জেলায় পঞ্চম শ্রেণিতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি নিয়ে এমন অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, অভিভাবকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং স্কুলে স্কুলে হাঙ্গামা হতে লাগল।

ঘটনার শুরু যাদবপুর বিদ্যাপীঠের মতো একটি নামী প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে। কয়েকদিন ধরেই এই প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণিতে ছাত্র-ভর্তিকে কেন্দ্র করে একটা আলোড়ন চলছিল। অভিভাবকদের একাংশ লটারির মাধ্যমে ছাত্রভর্তির বিরোধিতা করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। ১৭ ডিসেম্বর ঐ বিক্ষোভকে কেন্দ্র করেই শাসকদলের স্থানীয় দুই কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে একদল দুষ্কৃতী স্কুলের অফিসঘরে ঢুকে প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিগ্রহ করে। পেপার ওয়েট এমনকী চেয়ার পর্যন্ত শিক্ষকদের দিকে ছুঁড়ে মারে। কাগজ ফেলার ঝুড়ি শিক্ষিকার গায়ে উল্টে দেয়, চেয়ার-টেবিল, আলমারির কাঁচ ভাঙচুর করে, তিনজন ছাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রক্ষা করতে গিয়ে জখম হন। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এই ধরনের গুণ্ডামি বা আচরণ সমর্থন করা যায় না। কিন্তু পরিস্থিতি এই জায়গায় গেল কী করে?

কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে চোখে পড়ে সরকারি শিক্ষা বিভাগের খামখেয়ালিপনা, যার শিকার হচ্ছে রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও অভিভাবক। সকলেই জানেন, রাজ্যের নতুন সরকার কেন্দ্রীয় আইনের দোহাই পেড়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই আইন বলছে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বয়স অনুযায়ী যে কোনও ক্লাসে যে কোনও সময় ভর্তি হতে এলে নিতে হবে, ভর্তির ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। এই আইন পরীক্ষা ও পাশফেল প্রথাকে গুরুত্বহীন করে দেয়। চূড়ান্ত জনবিরোধী এই কালা আইনের বৈধতা রক্ষা করার জন্য সরকারি শিক্ষাবিভাগ ভর্তি পরীক্ষায় নিষেধাজ্ঞা জারি করল। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠল যে, বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে যত আসন তার থেকে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করলে স্কুল কীভাবে ভর্তি নেবে? এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত, বৈজ্ঞানিক ও সুষ্ঠু পদক্ষেপ ছিল ভর্তি-পরীক্ষা নেওয়া, এতে অভিভাবকদের কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু সরকারি শিক্ষাবিভাগ এতে নারাজ। কারণ, ভর্তি পরীক্ষা নিলে সরকারি ফতোয়া অমান্য হয়। অতএব পরীক্ষা যতই বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি হোক না কেন তা মেনে নেওয়া যাবে না। তা হলে কী ভাবে ছেলেমেয়েরা ভর্তি হবে? এই প্রশ্নকে ভিত্তি করেই সরকারি শিক্ষাবিভাগের জারি করা একের পর এক বিজ্ঞপ্তিতে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাপ্রেমী মহলে বিভ্রান্তি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। ১ নভেম্বর, ২০১১ প্রথম সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। ছাত্র ভর্তি হবে লটারির মধ্য দিয়ে এবং বিদ্যালয়ে ভর্তির দাবিদার সকল শিক্ষার্থীই লটারির আওতায় আসবে। তার পরে ৯ ডিসেম্বর জারি হল আর একটি বিজ্ঞপ্তি। জানানো হল, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারি ও বেসরকারি) থাকলে তাদের ছাত্রদের পঞ্চম শ্রেণিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভর্তি করতে হবে। এরপর আসন শূন্য থাকলে তখন শহরে ১ কিমি এবং মফঃস্বল ও গ্রামে ২ কিমির মধ্যে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য লটারি করা হবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে বিভ্রান্তি আরও বাড়ল। প্রথমত ১ নভেম্বরের বিজ্ঞপ্তির পর বিদ্যালয়গুলি একভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। কিন্তু যে মুহূর্তে ৯ ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি জারি হল, অভিভাবকদের একাংশ দাবি তুলতে লাগলেন পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত মানা চলবে না। শিক্ষকরা পড়লেন মহাসংকটে। বলাবাহুল্য, সরকারি শিক্ষাবিভাগের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিল।

সন্তানদের মনের মতো বিদ্যালয়ে ভর্তি করা নিয়ে অভিভাবকরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেই পারেন, এটা স্বাভাবিক। যখন তাঁরা দেখছেন যে, পরীক্ষা নেই, লটারির মত একটি জুয়া খেলার উপর তাঁদের সন্তানদের ভর্তি নির্ভর করছে তখন তো তিনি উদ্বিগ্ন হবেনই। তিনি চাইবেন বিদ্যালয় দ্রুত এই সমস্যার নিষ্পত্তি করুক। এটি সমস্যার একটি দিক। আবার শিক্ষক-শিক্ষিকারাও দু' ধরনের সরকারি সার্কুলারের ফাঁপরে পড়ে বিভ্রান্ত হলেন। কারণ তাঁরা দেখছেন, বাইরে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা প্রবল উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। আবার সরকার সার্কুলারে এও বলেছে যে, ১ জানুয়ারি থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু করতে হবে। তার আগেই ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। এটাও বিভ্রান্তিকর। কারণ, বছরের যে কোনও সময়ে যদি ভর্তি হওয়া যায়, তাহলে জানুয়ারির আগে ভর্তি শেষ করতে হবে — কথাটা অর্থহীন। এই অবস্থায় দ্রুত ভর্তির কাজ শেষ করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা চাইলেই নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বিদ্যালয় একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, তার কিছু বাঁধাধরা নিয়ম আছে, স্কুল পরিচালন কমিটির সভায় সে-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ১ নভেম্বরের সার্কুলারের পর পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সভা আহ্বান করে ভর্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারি শিক্ষাবিভাগের কর্তাদের এই সংবাদ না জানার কোনও কারণ নেই যে, পরিচালন সমিতির সভা ডাকতে ন্যূনতম ৭ দিন (বাস্তবে তার থেকে বেশি) সময় লাগবেই। এহেন একটা পরিস্থিতিতে ডিসেম্বরের ৯ তারিখ যদি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, যা স্কুলগুলোতে পৌঁছাতে আরও কয়েকটা দিন লাগবে, সে বিজ্ঞপ্তি পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির সাপেক্ষে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম। সে ক্ষেত্রে স্কুলগুলিকে পুনরায় পরিচালন সমিতির মুখাপেক্ষী হতে হবে। তা হলে ১৫ ডিসেম্বর পরিচালন সমিতির সভার চিঠি পাঠালে ২২ ডিসেম্বরের পূর্বে তা করা সম্ভব নয়। এ দিকে এই সময়ই সব বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে নবম শ্রেণির পরীক্ষার ফল বের করার কথা। এ ছাড়া রয়েছে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষা ও মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের ফর্ম ফিলাপ এর কাজ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি বড় দিনের ছুটি, ২ জানুয়ারি থেকে পঠন-পাঠন শুরু। বিদ্যালয়গুলি চাইবে পরিচালন সমিতিকে সামনে রেখে ভর্তি সমস্যার সমাধান করতে। অথচ তার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবে না। অপরদিকে অভিভাবকরা চাইবেন ডিসেম্বরের ২৪ এর মধ্যে তাদের সন্তানদের পছন্দের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে। স্বাভাবিকভাবে এই দ্বন্দ্ব প্রক্রিয়ায় জেলায় জেলায় ক্ষোভ-বিক্ষোভ ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। শিক্ষাবিভাগের এই অবিবেচনাপ্রসূত ও খামখেয়ালিপনার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল সাধারণ মানুষের বহু শ্রম ও রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু নামী বিদ্যালয়ের সম্পত্তি ভাঙচুর করল। এতে স্কুলগুলির সুনাম নষ্ট হয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা লাঞ্ছিত-নিগৃহীত হয়েছেন। এই অবাঞ্ছিত ঘটনার দায় কার? সরকারি শিক্ষাবিভাগ কি এ দায় অস্বীকার করতে পারে? ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভর্তি নিয়ে সৃষ্ট এই নৈরাজ্য শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত অপদার্থতাকেই নগ্ন করে দিয়েছে। এই অপদার্থতাই অভিভাবক ও ছেলেমেয়েদের শীতের ভোরেও স্কুলের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই অমানবিকতার প্রতিকার কোথায়! অথচ, শিক্ষার দাবিতে ৮ সেপ্টেম্বর ডি এস ও-র মিছিলকে কেন্দ্র করে যে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মহল সোচ্চারে বলেছিল, ছাত্ররা কেন মিছিলে যাবে? তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন কি, পাহাড়প্রমাণ সরকারি অপদার্থতা আজ শিশুদের পথে নামিয়েছে।

সিপিএম ফ্রন্টের ৯ দফা নীতি বনাম গত ৬ মাসের অভিজ্ঞতা

* সিপিএম ফ্রন্টের অন্যতম প্রধান নীতি ছিল জনগণের ট্যাক্সের টাকা ধ্বংস করে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা এবং সেটাকে স্বশাসনে রাখতে দলীয় অনুগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো। সেই 'ঐতিহ্য' গত ছ'মাসেও প্রত্যক্ষ করল এ রাজ্যের মানুষ। কলা অন্য কিন্তু কৌশল একই।
* ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় বসেই সিপিএম ফ্রন্ট শিক্ষা সংহারে লিপ্ত হয়েছিল। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল এবং ইংরেজি ভাষাশিক্ষা তুলে দিয়েছিল। এখনকার সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিচ্ছে। যদিও নির্বাচনী ইস্তেহারে উল্টো কথা লিখেছিল তারা।
* উচ্চশিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার হরণ করেছিল সিপিএম ফ্রন্ট। নতুন সরকার 'অর্ডিন্যান্স' জারি করে একই পথে হাঁটছে।
* সরকারি হাসপাতালগুলিকে কার্যত নরকে পরিণত করে নার্সিংহোমের মালিকদের মুনাফা লোটার ব্যবস্থা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ছিল সিপিএম সরকারের স্বাস্থ্যনীতি। বর্তমান সরকার বিবৃতিতে চমক দিচ্ছেন, সুপারকে ধমক দিচ্ছেন। কিন্তু পরিকাঠামো সেই বেহালই রয়েছে। চিকিৎসার অবহেলা, শিশুমৃত্যুর মিছিল, ওষুধ না পাওয়া সবই অতীতের মতোই বর্তমান।
* সরকারি আয় বৃদ্ধির জন্য মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে সামাজিক চেতনাকে ধ্বংসের চেষ্টা করা 'সিপিএম সরকারের' উন্নততর নীতি। গত মে মাসে গঠিত সরকার জুন মাসেই বলেছে রাজ্যে মদ তৈরির কারখানা বাড়াতে হবে। কী অদ্ভুত শিল্পায়ন!
* সংগ্রামের স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর সিপিএম সরকারের অন্যতম নীতি ছিল পুলিশ এবং আমলাদের দিয়ে গণআন্দোলন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা। নতুন সরকার আসার পর গত ১২ জুলাই হুগলির রিষড়ায় শ্রমিক মিছিলে নৃশংস লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ, ৫০ জন আহত। ৪ জনের আঘাত ছিল গুরুতর। মগরাহাটে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর গুলি চালিয়ে ২ জনের হত্যার পর মুখ্যমন্ত্রী বললেন, পুলিশের গুলি চালানো প্রয়োজন ছিল।
* রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-শরৎচন্দ্র-নেতাজি-ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের স্মৃতিবিজড়িত এই বীরভোগ্যা বাংলায় সাট্টা-জুয়া-ব্লুফিল্ম-নোংরা পত্রপত্রিকা ইত্যাদির অবাধ প্রসার ঘটিয়েছে সিপিএম। এসব করে বাংলার প্রতিবাদী সংস্কৃতিকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করা ছিল তাদের 'সাংস্কৃতিক নীতি'। এ সব বন্ধের উদ্দেশ্যে কোনও পদক্ষেপ নতুন সরকার এখনও নেয়নি। সবই আগের মতোই চলছে।
* 'উন্নয়ন'-এর ব্যান্ড বাজিয়ে গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের দাবিগুলিকে বস্তাবন্দি করে দেওয়া ছিল সিপিএম সরকারের 'বিপ্লবী' নীতি। গত ছ'মাসে কৃষক-খেতমজুর, চা শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, পাটচাষি, মোটরভ্যান চালক, পার্টটাইম টিচার, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, জবকার্ড হোল্ডার প্রমুখের দীর্ঘদিনের দাবিগুলি আজ পর্যন্ত বিবেচনার টেবিলে আসার সুযোগ পেল না। টেবিলে জমা কেবলই 'উন্নয়ন'-এর ফাইল।
* ধর্মঘট ঘেরাও মিছিল মিটিং-এ রাজ্য পিছিয়ে যাচ্ছে — এই ছিল সিপিএম ফ্রন্টের 'ব্র্যান্ড বুদ্ধবাণী'। নতুন সরকারও একই কথা বলছে শিল্পপতিদের সভায়। অথচ সিপিএম শাসনে ধরনা-ধর্মঘট তারাও কম করেনি।

তবে কি সরকার পরিবর্তন করে মানুষ ভুল করেছে? সরকার পরিবর্তন করে মানুষ কোনও ভুল করেনি। ভুলটা তখন হবে, যখন নতুন সরকারের কাছ থেকে জনগণ তাদের মৌলিক দাবিগুলির সুরাহা প্রত্যাশা করবে। এ প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে না। জনগণের দাবি 'আশা করার মাধ্যমে' পূরণ হয় না। দাবি আদায় করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন গণআন্দোলন। যা আজ গোটা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে। প্রবল আন্দোলনের জোয়ারে থৈ থৈ করছে আমেরিকা, ইউরোপ সহ লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং আরব দুনিয়ার দেশগুলি। আমাদেরও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই আন্দোলনের উপর। আমরা প্রত্যাশা করে মরব, না কি প্রতিবাদ করে দাবি আদায় করে বাঁচব সে সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে হবে। কারণ, মাসের শেষে ইলেকট্রিক বিলটা কোনও দল বিচার করে আসবে না। বাজার থেকে জিনিস কিনতে গেলে দলীয় পরিচয় কাজে লাগবে না। সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা লাটে উঠলে সাধারণ মানুষের জীবনটাও বেতাল ঘুড়ির মতো লাট খেতে থাকবে।

চাষির ধান সরকারকে কিনতে হবে

মেদিনীপুরে ডেপুটেশন

ধানের কুইন্টাল পিছু সহায়ক মূল্য ১৫০০ টাকা করা সহ চাষির সমস্ত ধান গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু অন্তত একটি ক্যাম্প করে কেনার দাবিতে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৯ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খাদ্য নিয়ামক, জেলা পরিষদের খাদ্য ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ঐ দাবি সম্পর্কিত স্মারকলিপি জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে পেশ করা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন নন্দ পাত্র, গোষ্ঠ কুইল্যা, অশোকতরু প্রধান, নারায়ণচন্দ্র নায়ক।

স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, ধানের দাম ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় কৃষকরা গোলায় জমে থাকা আগের মরশুমের উৎপাদিত ধান বিক্রি করতে পারছেন না। এরপর আমন মরশুমের ধান চাষির খামারে উঠতে যাচ্ছে। অথচ খাদ্যদপ্তর যে ধান কিনবে বলে বলছে তা চাষির ঘরে থাকা ধানের তুলনায় অনেক কম এবং তাও আবার কবে থেকে সংগ্রহ করবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তাই অবিলম্বে চাষির ঘরে জমে থাকা সমস্ত ধান গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প করে কেনার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ন্যায্য দামে ধান কেনার দাবিতে

বর্ধমানে কে কে এম এস-এর লাগাতার আন্দোলন

বর্ধমান জেলার লাউদোহা ব্লকে ন্যায্য দামে ধান কেনার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন (কে কে এম এস) গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। সরকার নির্ধারিত ১০৮০ টাকা কুইন্টাল দরে কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় এবং কালোবাজারি বন্ধ করে সরকার নির্ধারিত দামে সার ও কীটনাশক দেওয়ার দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর ব্লকের ২৬টি গ্রামে মাইক প্রচার ও পথসভা করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর কয়েকশ' চাষি লাউদোহা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় এবং দাবিপত্র পেশ করে। এই আন্দোলন চাষিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করে। ২২ ডিসেম্বর মেমারি, মন্তেশ্বর সহ অন্যান্য ব্লকেও অনুরূপ কর্মসূচি নেওয়া হয়। ঐ দিন বড়শুল ন'বস্তা পঞ্চায়েতের আউসা বাসস্ট্যান্ডে পথসভা চলার সময় হঠাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের ২০-২৫ জন দুষ্কৃতী হামলা চালিয়ে, হ্যান্ডবিল বুলেটিন ব্যানার ফেস্টুন ছিঁড়ে দেয়। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত বিশ্বাস ও অরুণাংশু সরকার সহ কয়েকজনকে মারধোর করে। তৃণমূল ব্লক সভাপতিকে বিষয়টি জানালে তাঁর কিছু করার নেই বলে তিনি জানান। এলাকার মানুষ এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন।

অতীতে সিপিএমও এই ধরনের ঘৃণ্য আক্রমণ করে আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারেনি। ২২ ডিসেম্বর বর্ধমান স্টেশন থেকে চাষিদের এক দৃপ্ত মিছিল জেলা শাসকের দপ্তরে যায়। কৃষক নেতা দনা গোস্বামী, শেখ নিশার সহ ৬ জনের প্রতিনিধি দল দাবিপত্র পেশ করলে জেলাশাসক জানান, বর্ধমান জেলায় মোট ১৬ হাজার মেট্রিকটন ধান উৎপন্ন হয়েছে। তার মধ্যে ৬ হাজার মেট্রিকটন ধান মিল মালিকদের কিনতে বলা হয়েছে। বাকি ধানের কী হবে? জেলাশাসক বলেন, তাঁর কাছে সরকারি কোনও নির্দেশিকা নেই। ধান কেনায় সরকারি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে চাষিরা কার্জন গেটের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

হলদিবাড়িতে চাষিদের অবস্থান বিক্ষোভ

রাসায়নিক সার, হাইব্রিড বীজ, কীটনাশক সহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের দামের ঊর্ধ্বগতি রোধ এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্য দামের দাবিতে ২৮ ডিসেম্বর কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে সারাদিনব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত করে এ আই কে কে এম এস।

সংগঠকরা বলেন, রাজ্যে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। চাষিরা মাঠ থেকে ফসল ঘরে তুললেই বাজারে দাম পড়ে যায়। ধান, পাট, গম, আনাজপাতির দাম এতটাই নিম্নমুখী যে, চাষিদের লাভের আশা দূরের কথা, উৎপাদন খরচই উঠছে না। অন্যদিকে সারের ভরতুকি তুলে দেওয়ায় এবং লাগামছাড়া কালোবাজারি চলায় সারের বাজার দর সরকার নির্ধারিত দামের থেকে অনেক বেশি। এই মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় কৃষকরা বেসামাল। ঋণগ্রস্ত কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। বিগত সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে এই মরণযাত্রা বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলেও সমানে চলেছে। এই সরকারের ২০০ দিনের মধ্যেই সারা রাজ্যে ৯ জন চাষি আত্মহত্যা করেছে। তা সত্ত্বেও সমস্যা নিরসনে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই।

এই অবস্থায় সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন আন্দোলনে নেমেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য স্তরে গণআইন অমান্য আন্দোলন হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে, মহকুমায় ডেপুটেশন, ঘেরাও, অবস্থান ইত্যাদি আন্দোলনের নানা কর্মসূচি চলছে। এ দিন সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল ব্লকের কৃষি আধিকারিককে স্মারকলিপি দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেড মানিক বর্মন, কমরেড গোপাল বর্মন, ব্লক সম্পাদক কমরেড আব্দুস সাত্তার সরকার প্রমুখ। বাসস্ট্যান্ডে এক পথসভায় এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রুহুল আমিন বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসকের দফতরে মহিলাদের বিক্ষোভ

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মেদিনীপুর শহর কমিটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসকের দফতরে ১৫ ডিসেম্বর বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ সভায় বক্তারা বলেন, যেভাবে রাজ্য জুড়ে মদ, গাঁজা, ব্রাউন সুগার প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের প্রসার বাড়ছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। এর ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। যুবসমাজ মাদকাসক্ত হয়ে শেষ হতে চলেছে। ১৬ ডিসেম্বর জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে দাবি জানানো হয় — (১) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় চোলাই মদের ঠেক অবিলম্বে তুলে দিতে হবে, (২) বিষাক্ত মদ যারা বিক্রি করছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, এবং (৩) মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

সড়ক দুর্ঘটনায় পার্টিকর্মীর অকাল মৃত্যু

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন-২ ব্লকের রেনজুড়া গ্রামের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কর্মী কমরেড শ্যামলাল গিরি (৫০) ধনেশ্বরপুর-মোহনপুর রোডের তুরকায় ১৮ ডিসেম্বর ম্যাটাডোর গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যু সংবাদে গ্রামের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রয়াত কমরেড ছাত্র অবস্থা থেকেই ছাত্র ও গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। সিপিএমের অত্যাচার ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও তিনি তেজ ও সাহসের সাথে জনগণের স্বার্থ নিয়ে লড়েছেন, দলের সংগঠন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। পরিবারের লোকজনদেরও দলের কাজে যুক্ত করেছেন। কমরেড শ্যামলাল গিরির অকাল মৃত্যুতে দলের লোকাল ও জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ৩০ ডিসেম্বর এলাকায় তাঁর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতি।

কমরেড শ্যামলাল গিরি লাল সেলাম

মঙ্গলাহাট হকাররা আন্দোলনের পথে

হাওড়া মঙ্গলাহাট হকাররা আন্দোলনের পথে। ১৮ অক্টোবর প্রশাসন বিনা নোটিসে বঙ্কিম সেতু থেকে বস্ত্র হকারদের উচ্ছেদ করে। প্রায় ৫০০০ হকার তাদের পরিবারের ২৫ হাজার মানুষকে নিয়ে জীবিকাহীন হয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন যাপন করছেন। আরও লক্ষাধিক পরিবার, যারা উল্টোডাঙা, সালকিয়া, দমদম, মেটিয়াব্রুজ, সন্তোষপুর, আক্রা, গার্ডেনরিচ সহ পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় বস্ত্র সেলাই করে এই বাজারেই নিয়ে এসে জীবিকা নির্বাহ করে আজ তারাও কাজ খুঁজে না পেয়ে অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছেন।

উচ্ছেদ হওয়ার পরে এই হকাররা হাওড়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং দলের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায় ঘুরেছে। কৃষিমন্ত্রী অরূপ রায়, শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু সহ সাংসদ অম্বিকা ব্যানার্জীর সাথেও সাক্ষাৎ করে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। মুখে বিকল্প ব্যবস্থার কথা বললেও কার্যত কোনও সুরাহা তাঁরা করেন নি। সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলেছে হকাররা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করতে পারবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। অথচ হাওড়া প্রশাসন কোন আইন বলে এবং কার নির্দেশে মঙ্গলাহাট হকারদের উচ্ছেদ করল এই প্রশ্নের উত্তর প্রশাসনের কোনও দপ্তরই দিতে পারছে না, শুধু বলছে উপর থেকে চাপ আছে। কার চাপ? হকাররা মনে করছেন সপ্তাহের একদিন মাত্র একবেলার হাটে তাদের জীবিকার অধিকার হরণের পিছনে রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র। ক্ষুদ্র ব্যবসায় বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশ ঘটানোর ঘৃণ্য চক্রান্তের ফলেই এই উচ্ছেদ। প্রতিবাদে ১৪ ডিসেম্বর হাওড়ার গুরদোয়ারাতে কয়েক শত হকারদের এক সভা হয়। সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সভাপতি, এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস সভায় উপস্থিত ছিলেন। হকার সংগ্রাম কমিটির সহ-সম্পাদক কমরেড মুরাদ হোসেন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯ ডিসেম্বর সকালে দুই হাজারেরও বেশি হকার কমরেড শান্তি ঘোষ, কমরেড তাপস দাস ও মঙ্গলাহাট হকার নেতা জয়ন্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ মিছিল করে সমস্ত হকারদের মিছিলে আসার আহ্বান জানান। মিছিলের শেষে গোলমোহর রেলওয়ে কলোনির মাঠে এক বিশাল সভায় বক্তব্য রাখেন হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাস। কমরেড শান্তি ঘোষ বলেন, আন্দোলন ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। তিনি ২২ ডিসেম্বর রাইটার্স অভিযান ঘোষণা করেন। গঠিত হয় 'হাওড়া মঙ্গলাহাট হকার্স ইউনিয়ন'। এ আই ইউ টি ইউ সি-র হাওড়া জেলা সম্পাদক কমরেড আলোক ঘোষ ইউনিয়নের সভাপতি এবং শান্তি ঘোষ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। হকারদের মধ্যে জয়ন্ত চৌধুরী, হায়দার খান, সুভাষ বিশ্বাস ও অরুণ দে এবং জৈমিনি বর্মন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। বিজয় মহারানা, লতিফ মিদ্দে, অভিজিত দে, তাপস দাস, পার্থ বণিক, রাজীব সাহা, কমল সাঁতরা, পিন্টু দাস, উদয় সাহা, সেখ সইজুল রহমান, তরুণ তালুকদার, বিশ্বজিত কুণ্ডুকে সহ-সম্পাদক এবং শুকদেব বারিককে কোষাধ্যক্ষ করে ২৯ জনের শক্তিশালী কমিটি নির্বাচিত হয়। ইউনিয়নের আহ্বানে ২২ ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে ২০০০ হকারের এক প্রতিবাদী মিছিল রাইটার্স অভিযান করে। কলেজ স্কোয়ারের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস, কমরেড অলোক ঘোষ ও হকার সংগ্রাম কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য কমরেড তপন মুখার্জী। বঙ্কিম সেতুতে সকাল ৯টা পর্যন্ত বসার দাবিতে হকার নেতৃত্ব ২৬ ডিসেম্বর পুরমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর এ এন এম (আর) কর্মচারীরা বঞ্চনার প্রতিবাদে সোচ্চার

১৮ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের এমপ্লয়িজ অ্যান্ড এ্যাসোসিয়েটস হলে হাসপাতালের এ এন এম (আর) কর্মচারীদের নানা বঞ্চনার প্রতিবাদে ওয়েস্টবেঙ্গল অক্সিলিয়ারি নার্সিং মিডওয়াইফারি (রিভাইজড) এমপ্লয়িজ সোসাইটির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা বলেন, এ এন এম (আর)-দের গ্রেড থ্রি নার্স হিসাবে নিযুক্ত করা হলেও আজও তাঁরা নার্সিং ক্যাডারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সাব সেন্টার ইনচার্জ হিসাবে সরকার স্বীকৃতি দিলেও তার জন্য কোনও ভাতা দেওয়া হয় না। ভ্যাকসিন দেওয়ার পর যে কোনও কারণবশত অঘটন ঘটলে তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এ এন এম (আর)-দের উপর এসে পড়ে, মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। বিপদে পড়লে কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপত্তা চেয়েও অনেক সময় পাওয়অ যায় না। ডট ও এম ডি টি দেওয়ার জন্য কোনও রিস্ক এ্যালাওয়েন্স দেওয়া হয় না। এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ এলাকায় ৫০০০ ও অনগ্রসর এলাকায় ৩০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য বর্তমান জনসংখ্যা অনুযায়ী নতুন সাব সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়নি। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হলেও বঞ্চনার প্রতিকার হয়নি। বহুদিন যাবত ইউনিফর্ম ও ওয়ার্কিং অ্যালাওয়েন্সও বৃদ্ধি করা হয়নি। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সল্টলেকে প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন অঞ্চলে

১৪৪ ধারার প্রতিবাদ

সল্টলেকের প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে বলে সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (সি)-র সল্টলেক আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্যামল দত্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ৩০ ডিসেম্বর সল্টলেকের মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়।

তাঁরা মহকুমা শাসককে জানান, বিকাশ ভবন সহ সংলগ্ন অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই বিকাশ ভবন এবং তার সংলগ্ন কিছু ভবনে কয়েকজন মন্ত্রীর দপ্তর থাকায় ছাত্র-শিক্ষক-বেকার যুবক-যুবতী চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বহু বঞ্চিত মানুষ তাঁদের দাবি দাওয়া জানাতে এই অঞ্চলে আসেন এবং সভা সমাবেশে মিলিত হয়ে তা তুলে ধরেন। এই অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করবে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানান।

বাঁকুড়ায় মদ্যপান বিরোধী সংগ্রাম কমিটি

বাঁকুড়া শহরেও রমরমিয়ে চলছে চোলাই মদের ঠেক। বহু পরিবারে মদে আসক্ত পুরুষরা মহিলাদের উপর লাঞ্ছনা ও শারীরিক অত্যাচার চালায়। মারধোর ও লাঞ্ছনার থেকে রেহাই পেতে মেয়েরা রামপুরে গড়ে তুলেছে মদ্যপান বিরোধী সংগ্রাম কমিটি। তারা নিয়মিত সন্ধ্যের সময়ে পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে খোঁজ নিতে থাকে কোথায় মদের কারবার চলছে। এভাবে চলতে চলতে বেশ কিছু পাড়ায় মহিলাদের নিয়ে মাদক পান বিরোধী সংগ্রাম কমিটি গড়ে উঠেছে। বহু সাধারণ মানুষ নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিছু বস্তিতে ভাটি উচ্ছেদ হয়েছে। এই প্রবল ঠাণ্ডাতেও পাড়ায় পাড়ায় নানাভাবে মদ্যপান বিরোধী অভিযান চলছে। সকলেই উপলব্ধি করছেন আন্দোলন ও নজরদারি ছাড়া এ জিনিস বন্ধ করা যাবে না।

শুধু অনাহারে নয় এ দেশে শীতেও মরে মানুষ

প্রবল ঠাণ্ডার কবলে পড়ে এ বছর ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ১৩৫ জন। এ হিসাব সরকারি। বাস্তবে মৃত কতজন, কে তার খবর রাখে! মৃত এইসব মানুষ গৃহহীন, পথবাসী। হিমশীতল রাতগুলোতেও মাথা গোঁজার ঠিকানা তাদের একটাই — শহরের ফুটপাথ।

ঠাণ্ডায় মৃত্যু এ দেশে কোনও নতুন ঘটনা নয়। প্রতি বছরই মানুষ এখানে না খেতে পেয়ে মরে। রোগে ভুগে ওষুধ না পেয়ে হাসপাতালের গেটের সামনে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকে। ঠাণ্ডাতেও জমে মরে যায় ঘরহারা মানুষ। গরিবের প্রাণের এখানে কানাকড়িও দাম নেই। বছরের পর বছর শীতকাল জুড়ে অনাহারী, আধপেটা খাওয়া, ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যের মানুষের মৃত্যুমিছিল দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছে আমাদের।

গত ১২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের সরকারগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে, ১ লক্ষ নাগরিক পিছু একটি করে নাইট শেল্টার তথা ঘরহারাদের জন্য রাত্রিকালীন আবাস তৈরি করার। এ বছর ঠাণ্ডায় যাতে একজন মানুষেরও প্রাণ না যায়, রাজ্য সরকারগুলিকে তা দেখতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

এ পরেও লজ্জিত না হয়ে একদল প্রশ্ন তুলেছেন, রাজ্য প্রশাসনের আওতাভুক্ত এই বিষয়টিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দেওয়ার এক্তিয়ার আছে কি নেই তাই নিয়ে। সব ছাপিয়ে এই বড় প্রশ্নেরই তো জবাব পাওয়া দরকার যে বিশ্বের সর্বোচ্চ ধনীদের তালিকায় প্রতি বছর যে ভারতের পুঁজিপতিদের নাম ক্রমাগত বেশি সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, সেই ভারতেরই এত মানুষকে আজও ফুটপাতে বাস করতে হচ্ছে কেন? কেন এখনও এত বেশি নিরুপায় মানুষকে ঠাণ্ডায় জমে মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হতে হচ্ছে? বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশগুলির মধ্যে যখন ক্রমেই অন্যতম স্থান অধিকার করছে ভারত, তখন সে দেশের নাগরিকদের কাছ থেকে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারটুকুও কেন প্রতিদিন লুঠ হয়ে যাচ্ছে?

আসলে সরকারগুলির কাছে ফুটপাতের বাসিন্দা প্রান্তিক মানুষগুলির জীবনের কোনও দামই নেই। তাই, পুঁজিবাদী 'উদার অর্থনীতি'র কল্যাণে উচ্ছেদ হওয়া, সর্বস্ব হারাতে বসা মানুষের ঢেউ শহরের রাস্তায় রাস্তায়, ফ্লাইওভারের নিচে, স্টেশন চত্বর, বাসস্ট্যান্ড, ফুটপাথে যত বেশি করে আছড়ে পড়ছে, ততই কমছে এই মানুষগুলির জন্য বানানো সরকারি রাতঠিকানার সংখ্যা। খোদ রাজধানী দিল্লি শহরে সরকারি হিসাবে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা ৫৬ হাজার, বেসরকারি মতে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার। অথচ এদের জন্য শেল্টার আছে মাত্র ৬৪টি। তার মধ্যে আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ২১টি। অতি সম্প্রতি দিল্লি প্রশাসন নির্মীয়মান একটি নাইট শেল্টার ভেঙে দিয়েছে। যেদিন সেটা ভাঙা হল, সে দিন দিল্লির তাপমাত্রা নেমেছিল ৪.৭° সেন্টিগ্রেডে। গত দু'বছর ধরে কমনওয়েলথ গেমস-এর জন্য শহর সাজানোর নামে গরিব মানুষের অসংখ্য ঝুপড়ি, অতি কষ্টে গড়ে তোলা মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু একের পর এক গুঁড়িয়ে দিয়েছে দিল্লি প্রশাসন। মহিলা, শিশু সহ পরিজনদের নিয়ে রাস্তায় আশ্রয় নিতে হয়েছে উচ্ছেদ হওয়া অসহায় মানুষগুলিকে। শুধু দিল্লিই নয়, গোটা দেশের প্রায় সমস্ত বড় শহরেরই এক চিত্র। রাস্তায় আশ্রয় নিয়েও রেহাই নেই। বড় রাস্তা থেকে তাদের হঠিয়ে দেওয়ার জন্য লাঠি উঁচিয়ে তৈরি আছে পুলিশ। ফলে রাতটুকু কোনওমতে কাটাতে আশপাশের গলিঘুঁজিই ভরসা। দুঃসহ সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন হায়দ্রাবাদের ৭০ বছরের পথবাসী এক বৃদ্ধা — আমিনা বাই। বলেছেন, '' বড় রাস্তায় ঘুমালে পুলিশ হঠিয়ে দেয়। এদিকে গলির রাস্তাগুলো বড় বেশি ঠাণ্ডা। আর এই প্লাস্টিকের টুকরোটা ছাড়া তো গায়ে দেওয়ার কিছু নেই, তাই প্রতি রাতে বড় রাস্তাতেই শুতে যাই মনে আতঙ্ক নিয়ে — কখন পুলিশের লাঠির ঘা এসে পড়ে''।

এভাবেই অমানুষের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় ফুটপাতের মানুষ। যে ক'জনের সরকারি হোমের আশ্রয় জোটে, তাদেরও দুর্দশা কিছু কম নয়। চূড়ান্ত নোংরা পরিবেশে কোনওরকমে গাদাগাদি করে থাকা। নিরাপত্তার কোনও দায়িত্বই সরকার বা পুলিশ নেয় না। কোথাও কোথাও পরিবেশ এতটাই খারাপ যে, ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় বাস করাই শ্রেয় মনে করে মানুষ।

জীবিকার টানে, সন্তানের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দেওয়ার তাগিদে দূর গ্রামের ঘর ছেড়ে আসা ফুটপাতবাসী রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ছোট দোকানদার কিংবা পরিচারিকাদের জীবনগুলো বয়ে চলেছে এভাবেই। এই জীবনেরই শরিক দেনার দায়ে উচ্ছেদ হওয়া সর্বস্বান্ত চাষি, বন্ধ কারখানার শ্রমিক। জনমজুরি খেটে, মোট বয়ে সারাদিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের শেষে ক্লান্ত শরীরে ফুটপাতের বিছানায় আশ্রয় নেয় তারা। প্রবল শীতের কুয়াশাভরা হিমেল রাত বিকট হাঁ করে যেন গিলতে আসে তাদের। নিত্যদিন পুলিশের হামলা ছাড়াও নানা রোগব্যাধি তাদের চিরসঙ্গী। ধুঁকে ধুঁকে ক'টা বছর বেঁচে চিকিৎসার অভাবে অকালমৃত্যুই অমোঘ ভবিতব্য। এইসব দুর্দশার পাশাপাশি ফুটপাতের মহিলাদের তাড়া করে বেড়ায় ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির অবিরাম আতঙ্ক। ঘরছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি বিকৃত লালসার শিকার হয়, বেশিরভাগই খিদের জ্বালা ভুলতে ড্রাগের খপ্পরে পড়ে, নিদেনপক্ষে আঠার টিউব বা বুটপালিশের গন্ধ টেনে নেশায় ঝিমিয়ে থেকে কাটিয়ে দিতে চায় অভিশপ্ত জীবন। এরই মধ্যে শীতের কোনও কোনও রাত বয়ে আনে মৃত্যুর হিমশীতল ছোঁয়া। সরকার পালটায়, কিন্তু পালটায় না এদের দুর্বিষহ জীবনধারা।

এর পরেও কি বুঝতে অসুবিধা হয় যে, সরকার, তার প্রশাসন কিংবা বিচারালয়ের মানবিক হস্তক্ষেপের মুখ চেয়ে বসে থেকে কোনও লাভ নেই? ঘরহারা নিরুপায় এত মানুষের এই করুণ মৃত্যু যদি আমাদের চোখে একফোঁটা জলও আনে, রুগ্ন, অপুষ্ট ফুটপাথের শিশুর বিবর্ণ মুখ একবারও যদি প্রশ্ন জাগায় — কার দোষে তার এই দুঃসহ জীবন, তা হলে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চোখ ফেরাতে হবে এই দুর্দশার উৎসের দিকে। অন্যায় শোষণের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যে ব্যবস্থা এই সমাজেরই কিছু মানুষকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ফুটপাতে, বাধ্য করেছে ডাস্টবিনের খাবার খুঁটে খেতে, শীতের কামড়ে অসহায় ভাবে মরতে, প্রশ্ন তুলতে হবে সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা নিয়েই। তা না হলে শত নির্দেশিকা জারি করেও বন্ধ করা যাবে না এই মৃত্যুমিছিল।

ধনুরহাটে পার্টি অফিস উদ্বোধন

এলাকার বিভিন্ন গ্রামের বহু কর্মী, সমর্থক, দরদীর উপস্থিতিতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় ১৩ নভেম্বর মন্দিরবাজার থানার ধনুরহাট লোকাল কমিটির উদ্যোগে নেতাজী মোড়ে স্থানীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রীতীশ কর। অফিসের জায়গা দান ও অফিস তৈরি করার সাহায্য করেছেন কমরেড যুধিষ্ঠির মণ্ডল, বেবী মণ্ডল, বিশ্বনাথ মণ্ডল ও সোমনাথ মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন ধনঞ্জয় মণ্ডল। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু। তিনি বলেন, এই অফিস গণআন্দোলন গড়ে তুলতে এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উপস্থিত ছিলেন কমরেডস মাদার লস্কর, শ্যামল প্রামাণিক ও প্রহ্লাদ পুরকাইত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কাজের সন্ধানে বহু মানুষ ইউরোপ ছাড়ছে

ইউরোপ থেকে সাধারণ মানুষ দলে দলে পাড়ি দিচ্ছে দক্ষিণ দিকে, আফ্রিকার দেশগুলিতে। যে ইউরোপ একদা ছিল যুদ্ধ-উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত বা বিতাড়িত ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থান, দরিদ্র মানুষের কোনও কাজ করে জীবনধারণের জায়গা, সেই ইউরোপের সাধারণ মানুষ আজ বিপন্ন। তাদের নিজেদেরই বেঁচে থাকার কোনও সংস্থান নেই নিজ দেশে। দুমুঠো খাবার যোগাড়ের জন্যে তারা ছুটছেন ব্রাজিল, অ্যাঙ্গোলা, অস্ট্রেলিয়া — এইসব দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলিতে। বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এমনই হাল করে ছেড়েছে এইসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের।

ইংল্যান্ডের গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছে সদ্য অতীত ২০১১ সালে গ্রিসের ২৫০০ নাগরিক অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছে এবং আরও ৪০ হাজার নাগরিক যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আয়ারল্যান্ডের সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস দেখিয়েছে, এ বছরের শেষদিকে প্রায় ৫০ হাজার নাগরিক অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকায় চলে যাবে। পর্তুগালের বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর উদ্ধৃত করে গার্ডিয়ান লিখেছে, কমপক্ষে ১০ হাজার পর্তুগিজ নাগরিক তেল-সমৃদ্ধ অ্যাঙ্গোলিয়ায় চলে গেছে। ৬০ বছর আগে অ্যাঙ্গোলা পর্তুগিজ উপনিবেশ ছিল। ২০১১ সালের ৩১ অক্টোবরের হিসাব অনুযায়ী, ৯৭,৬১৬ জন পর্তুগিজ নাগরিক লুয়ান্ডা এবং বেঙ্গুয়েলা কনস্যুলেটে নাম রেজিস্ট্রি করেছে যাওয়ার জন্য। ২০০৫ সালে যত সংখ্যক পর্তুগিজ নাগরিক দেশ ছেড়েছে এই সংখ্যা তার দ্বিগুণ। পর্তুগিজরা তার পূর্বতন উপনিবেশ মোজাম্বিক এবং ব্রাজিলেও কাজের সন্ধানে যাচ্ছে। ব্রাজিল সরকারের হিসাবে, ২০১০ সালের ডিসেম্বরে সে দেশে বৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৭৭ জন, যা দ্রুত বেড়ে গিয়ে ২০১১ সালের জুনে দাঁড়িয়েছে ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার।

কেন দেশ ছাড়ছে পর্তুগালের মানুষ? কারণ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ। দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ঋণাত্মক অঙ্কে চলে গেছে। ঋণে জর্জরিত গোটা দেশ। খাদে পড়া অবস্থা থেকে দেশের অর্থনীতিকে তুলতে ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ ৭৮ বিলিয়ন ডলারের যে ত্রাণ প্যাকেজ দিয়েছে তার শর্ত স্বরূপ সরকারি ক্ষেত্রের লাগামহীন বেসরকারিকরণ, ছাঁটাই, শ্রমের বাজার সংস্কারের নামে শ্রমিকদের অধিকার হরণ, বেতন হ্রাস মারাত্মকভাবে ঘটছে, যার ফলে তীব্র মূল্যবৃদ্ধির বাজারে বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। পেটের জ্বালায় মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

গ্রিসের অবস্থাও তাই। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাবে ২০১০ সালে ১২ লক্ষ ১০ হাজার গ্রিক নাগরিক দেশান্তরিত হয়েছেন। গত এক বছরেই গ্রিসের ৪,৮৮৬ জন ডাক্তার অর্থাৎ মোট ডাক্তারের ৯.৪ শতাংশ দেশ ছেড়েছেন। হাজার হাজার মানুষের এই দেশত্যাগ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই দেশগুলির অর্থনীতি এমনভাবে ভেঙে পড়েছে যে, এখানে বসবাস করা মানে না খেয়ে মরার উপক্রম। 'আমি যদি গ্রিসে রয়ে যেতাম পরিবারের সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত'—বলেছেন কাজের সন্ধানে গ্রিস থেকে অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসা জয় ড্রাসিস। খেয়ে পরে বাঁচার সুযোগ থাকতে কে তার মাতৃভূমি ত্যাগ করতে চায়? 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী'। সেই 'জননী জন্মভূমির' এমন নরক দুর্দশা হল কোন অর্থনৈতিক নিয়মে?

ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক দুর্দশা ভয়াবহ। 'গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনীতি বেহাল, তার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থা প্রায় অবর্ণনীয়। দেনার দায়ে গ্রিসের নাভিশ্বাস উঠছে। ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন, আয়ারল্যান্ডও রোগ শয্যায়। দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে মানুষ তিতিবিরক্ত। গণবিক্ষোভে গ্রিস এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। যে দুটি দেশ এখন অবধি ইউরোপের রক্ষাকর্তা সেই জার্মানি এবং ফ্রান্সের জনমত ক্রমে সরকারের বিপক্ষে ঘুরছে। এইসব দেশে দেড়শ-দু'শো বছর ধরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু রয়েছে। কী দিয়েছে এই পুঁজিবাদ? দিয়েছে একদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের বিপুল বৈভব, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে সীমাহীন দুর্দশা, এই হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিণাম। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলকথা শ্রমিকের শ্রম লুণ্ঠন করে মালিকের সম্পদ বৃদ্ধি করা। এতেই জন্ম নেয় বৈষম্য। অর্থনীতিতে দেখা দেয় নৈরাজ্য; সমাজে দেখা দেয় ভারসাম্যহীনতা। সংখ্যাগরিষ্ঠের বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে সমাজ। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, রোগে চিকিৎসার পয়সা নেই, খেটে দু'পয়সা উপার্জনের কাজও নেই। এইরকম একটা অবস্থা এনে দিয়েছে পুঁজিবাদ। বাধ্য হয়ে মানুষ বাস্তুভিটা ত্যাগ করে পাড়ি দিচ্ছে অন্যদেশে, কাজের আশায়।

কিন্তু সেখানে কি সুখ নিশ্চিত? আপাতত কিছু কাজ জুটলেও যেহেতু ঐসব দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতিই বিদ্যমান, ফলে সেখানে অদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ সংকট সৃষ্টি হবে। বেকার সমস্যা তীব্র রূপ নেবে, জবলেস গ্রোথের জবলেসনেসকে আড়াল করতে বলা হবে বিদেশিরাই চাকরি অধিকার করে আছে। দাবি উঠবে বিদেশি বিতাড়নের, যেমন উঠেছে ইতিপূর্বে ফ্রান্সের মতো দেশে। তাকে ভিত্তি করে সেখানে ঘটেছে জাতিদাঙ্গা। বেঘোরে প্রাণ গেছে নিরীহ মানুষের।

পুঁজিবাদ দিয়ে যে আজ আর চলতে পারে না, ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই দেশান্তরের স্রোত বিশ্ববাসীকে তা দেখিয়ে দিচ্ছে। আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনও একথাই তুলে ধরেছে। স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, পুঁজিবাদ ১ শতাংশের জন্য, ৯৯ শতাংশ সাধারণ নাগরিকের জন্য নয়।

এরপরেও কি পুঁজিবাদের পক্ষে থাকা চলে? চলে কি এই মৃতপ্রায় ব্যবস্থাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া? এদেশে যারা দক্ষিণপন্থার নাম নিয়ে এই পুঁজিবাদকেই দীর্ঘজীবী করছেন বা বামপন্থার নাম নিয়ে পুঁজিবাদকেই টিকিয়ে রাখছেন ইউরোপের এই চিত্র তাদের সম্বিত ফেরাবে কি?

খাদ্যমন্ত্রীর কাছে ১১ দফা দাবিপত্র পেশ সংগ্রামী গণমঞ্চের

রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে উত্তর দিনাজপুরের সংগ্রামী গণমঞ্চের পক্ষ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ৭০ জনের এক প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসে খাদ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি দেয়। ২০০৯ সালে গড়ে ওঠা রেশন গ্রাহকদের এই সংগঠনটির ধারাবাহিক আন্দোলনে বেশ কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ডিলার বরখাস্ত হয়েছিল। তাদেরই কয়েকজন হেমতাবাদ থানার চৈনগড় অঞ্চলের ১১৪ নং রেশন ডিলার রায়গঞ্জের বিন্দোলের ৩২৫নং এবং গোয়ালপোখর থানার ৫৪নং রেশন ডিলার প্রশাসনের একাংশের যোগসাজশে পুনর্বহাল হওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। গত ১৯ ডিসেম্বর হেমতাবাদ ব্লকে রেশন সামগ্রী পাচারের সময় এক ডিলারকে হাতেনাতে ধরা হলেও তার শাস্তি হয়নি।

দুর্নীতিগ্রস্ত ডিলারদের শাস্তির দাবিতে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সহ দরখাস্ত প্রশাসনের স্তরে স্তরে দিলেও আজও কারও শাস্তি হয়নি। প্রাপ্য চাল, আটা, গম, চিনি কেরোসিন তেল কম দেওয়া, বেশি দাম নেওয়া, রসিদ না দেওয়া, কোথাও কোথাও কোনও মাসে কোনও সপ্তাহের পুরো সামগ্রী আত্মসাৎ করা অব্যাহত রয়েছে। কোথাও কোথাও মাসে মাত্র এক দুবার রেশন দোকান খোলা হয়। এছাড়া রয়েছে রেশন কার্ড করা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি। খাদ্যদপ্তরের বিভিন্ন ব্লক অফিসে অফিসস্টাফের বাইরেও কিছু লোক থাকে যারা স্টাফের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে রেশন কার্ড করে দেয়। যারা টাকা দিতে পারেন না বছরের পর বছর ঘুরেও তাঁরা নতুন কার্ড পান না। ২০০৬ সালে আবেদন করেও এখনও বহু মানুষ রেশন কার্ড পাননি। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতেই এই ডেপুটেশন বলেই জানান সংগ্রামী গণমঞ্চের সভাপতি দুলাল রাজবংশী।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

বর্ধমান জেলা বিড়ি শ্রমিক সম্মেলনে

ন্যায্য মজুরির দাবি

১৮ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কালনা মহকুমার ধাত্রীগ্রামে। রাজ্যের ১১ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৭০ হাজার বিড়ি শ্রমিক বর্ধমান জেলায় থাকলেও, জেলার বিড়ি শ্রমিকরা সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ১৪২.৭৩ টাকা পায় না। পায় মাত্র ৬০ টাকা। তাও বহু আন্দোলনের ফলে। শ্রমিকদের বেশিরভাগেরই পরিচয়পত্র নেই, কল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য সামাজিক কল্যাণ দপ্তর নেই, স্ট্যাটিক কাম মোবাইল ইউনিট নেই, ডাক্তার নেই, বহু অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত এবং বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন পরিচালিত বর্ধমান জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের এই দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। তাতে মজুরি কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে, বেশ কিছু শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দিতে পারা গেছে। সহস্রাধিক শ্রমিকদের উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী, বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রবীর দে। কমরেড নির্মল মাঝিকে সম্পাদক ও কমরেড সুচেতা কুণ্ডুকে সভাপতি করে ৪০ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশ

ঢাকায় গণবিক্ষোভে পুলিশি বর্বরতা

২৯ ডিসেম্বর কুইক রেন্টালের নামে লুটপাট ও জনগণের পকেট কাটার সিদ্ধান্ত বাতিল, নতুন করে পি এস সি-র প্রক্রিয়া বন্ধ সহ গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে ৭ দফা দাবিতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আহূত জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাওয়ের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বিনা প্ররোচনায় পুলিশি হামলা ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান।

ঐ দিন শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মিছিল শেষে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে পুলিশ অর্তকিতে মিছিলের উপর হামলা ও টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। হামলায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মলয় সরকারের বাঁ হাতে টিয়ারসেল লাগে এবং তাঁকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এ ছাড়া আহত হন বাসদ নেতা মাসুদ মিয়া ও আনোয়া হোসেন বাবু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কর্মী সহ প্রায় ২৫ জন নেতা-কর্মী।

কমরেড খালেকুজ্জামান হামলাকারী দোষী পুলিশের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানান এবং সরকারি হামলা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এই হামলার প্রতিবাদে ৩০ ডিসেম্বর বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন ও সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান তমাল এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ব্যারিকেড করে গণবিক্ষোভ আটকাতে চেষ্টা করছে পুলিশ

খাদ্য সুরক্ষা বিল

জনগণের দুঃখদুর্দশার প্রতি নির্মম পরিহাস

২২ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে পেশ হওয়া খাদ্য সুরক্ষা বিল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

দেশবাসীর খাদ্য সুনিশ্চিত করার নামে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে এই যে বিলটি পেশ করল, তা ক্ষুধার্ত ও অপুষ্টি কবলিত সবহারা মানুষের দুঃসহ দুর্দশা কমানোর সৎ প্রচেষ্টার পরিবর্তে প্রতারণা হিসাবেই পরিগণিত হবে। বরাদ্দ করা হয়েছে মাসে মাত্র ৭ কেজি দানা শস্য, তাও মাত্র গ্রামীণ জনগণের ৪৬ শতাংশের এবং শহরের ২৬ শতাংশের জন্য। তাছাড়া বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যে ১৫ কেজি দানা শস্য মাসে প্রয়োজন, বরাদ্দ করা হয়েছে তার চেয়ে কম। মাসে মাত্র ৪ কেজি দানাশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে গ্রাম ও শহরের অবশিষ্ট মানুষের জন্য এবং তাও গ্রামে ৯০ শতাংশ বা শহরের ৫০ শতাংশের বেশি নয়। এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস। এই সামান্য বরাদ্দটুকুও প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছাবে না। কারণ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি যে মেশিনারি এটা কার্যকর করার দায়িত্ব পাবে তারাই এটা আত্মসাৎ করবে, যেমনটি দেখা গেছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনা, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, আই সি ডি এস এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে। সরকারের উচিত জনগণের দাবি মেনে খাদ্যসংগ্রহ এবং বণ্টন উভয় দায়িত্ব সরাসরি এবং সামগ্রিকভাবে পালন করা। সেই বিধান না রেখে তৈরি করা এই বিল সমস্যার কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না এবং নিছক ধোঁকাবাজিতে পরিণত হবে। এই মধুমাখা বিলের একমাত্র উদ্দেশ্যই হল জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আসন্ন নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসকে নির্বাচনী ফয়দা দেওয়া।

দেশের জনগণের কাছে আমাদের আহ্বান, দেশব্যাপী শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলুন যাতে এই বিলের নানা ফাঁক এবং অসঙ্গতিগুলি দূর করতে এবং যথার্থ ও কার্যকরী খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য করা যায়, যা দেশের অভাবী, ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব মানুষকে প্রকৃতই কিছুটা স্বস্তি দিতে পারবে।

পার্লামেন্ট অভিযান

প্রথম পাতার পর

এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার কী? নির্বাচন? সরকার পরিবর্তন? সে তো বহুবার হয়েছে। তাতে কি এই দুঃসহ অবস্থার এতটুকুও পরিবর্তন হয়েছে? কেন হল না? প্রথমত, সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জনগণের প্রতি দরদবোধ থেকে জনগণের দুর্দশা লাঘব করতে সচেষ্ট হয়নি শুধু নয়, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে, সংকটের উৎসস্থল এই পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখছে এবং তা করতে গিয়ে জনগণের উপর সংকটের বোঝা চাপিয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হল দেশব্যাপী শক্তিশালী গণআন্দোলনের অনুপস্থিতি। যে শক্তিশালী গণআন্দোলন সরকারের জনবিরোধী নীতি আটকে দিতে পারে তেমন ধরনের কোনও আন্দোলন গড়ে না ওঠায় শাসকশ্রেণী জনবিরোধী নীতি প্রণয়নে বল্গাহীন। 'জনগণের কাছের লোক', 'কাজের লোক', 'জনগণের সেবক' বলে যে সমস্ত দল নির্বাচনের সময় পাড়ায় পাড়ায় দেওয়াল লিখে ভরিয়ে দিয়েছে এবং জনগণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে ভোট নিয়েছে, জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তাদের কোনও প্রতিবাদ নেই। তারা ভোটের পাখি। ভোট ফুরিয়েছে। তাদের আর দেখা নেই। এই 'কাজের লোকেরা' এম এল এ, এম পি হয়ে সরকারের জনবিরোধী নীতি একের পর এক কার্যকর করে দ্রুত জনগণের শত্রুতে পরিণত হচ্ছে। তখন সেই শূন্যস্থান ভরাতে আর এক নতুন প্রতারক 'কাজের লোকের' ভেক ধরে এসে ভোট চায়। এ জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে স্বাধীনতার ৬৪ বছর ধরে।

জনগণের এই দুঃসহ অবস্থা নিরসনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কেন্দ্রীয় কমিটি দেশব্যাপী একক উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। দলের কর্মীরাও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। চলছে জনগণকে যুক্ত করে আন্দোলনকে দুর্নিবার শক্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা। এই আন্দোলনই জনগণের একমাত্র রক্ষাকবচ। গোটা দেশ জুড়ে চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ। লক্ষ্য ৫ কোটি। দলের কর্মীরা রাস্তায় স্টেশনে, স্কুলে-কলেজে, অফিসে-আদালতে, হাটে-বাজারে-পাড়ায় পাড়ায় দাবিপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। জনগণও উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসে স্বাক্ষর দিচ্ছেন, দাবিপত্র নিয়ে গিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে দিচ্ছেন। বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ এই কর্মসূচির জন্য অর্থসাহায্যও করছেন। এই সমস্ত স্বাক্ষরপত্র নিয়ে দিল্লিতে রাজপথ ভরে উঠবে জনতার পদচারণায়। আসুন, এই স্বাক্ষর-সংগ্রহ আন্দোলনকে দেশের প্রান্ত-প্রত্যন্তে ছড়িয়ে দিই। দেশজুড়ে আজ সমস্বরে আওয়াজ তুলি, আমরাই ৯৯ শতাংশ, তোমরা ১ শতাংশ। আমাদের দাবি তোমাদের মানতেই হবে।

১৪ মার্চের দাবি সনদ

- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, কালোবাজারি ও মজুতদারি বন্ধ
- খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু ● পেট্রল-ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার
- খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি এবং এফ ডি আই-এর অনুপ্রবেশ বন্ধ
- গরিব চাষিদের কৃষিঋণ মকুব
- চাষিদের সুলভে ডিজেল, বিদ্যুৎ, সেচের জল ও সার সরবরাহ
- সরকারকে কৃষিপণ্য ন্যায্য দামে চাষির কাছ থেকে ক্রয়
- বহুজাতিক সংস্থার বি ও টি/পি পি পি স্কিমের রাস্তা চওড়া করার অজুহাতে কৃষিজমি অধিগ্রহণ বন্ধ
- যথার্থ সামাজিক প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ● শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ
- অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ও স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা বাতিল
- স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি ও হাসপাতালে চার্জ বৃদ্ধি বন্ধ
- নারী নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ ● অপসংস্কৃতি ও মদ-জুয়া-সাট্টা বন্ধের উপযুক্ত ব্যবস্থা
- কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি
- কাজ না দেওয়া পর্যন্ত সকল বেকারকে বেকারভাতা প্রদান
- লক-আউট, লে-অফ, ক্লোজার, ছাঁটাই বন্ধ করা ● ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল, সরকারি দপ্তরে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ
- স্থায়ী কাজে চুক্তিতে নিয়োগ বন্ধ ● শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার খর্ব না করা এবং শ্রম আইন লঙ্ঘন না করা
- গ্রামীণ মজুর সহ সকল শ্রমিকের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বেতন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ● সেজ আইন বাতিল
- খনি ও জল সহ প্রাকৃতিক সম্পদকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে না দেওয়া ● নতুন পেনশন স্কিম প্রত্যাহার
- সর্বস্তরে দুর্নীতি বন্ধ করা ● আধার যোজনা ও আফস্পা সহ কালাকানুন বাতিল

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।